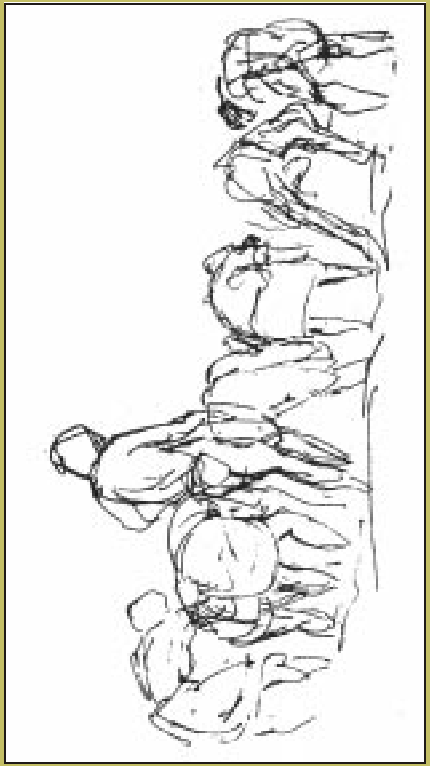

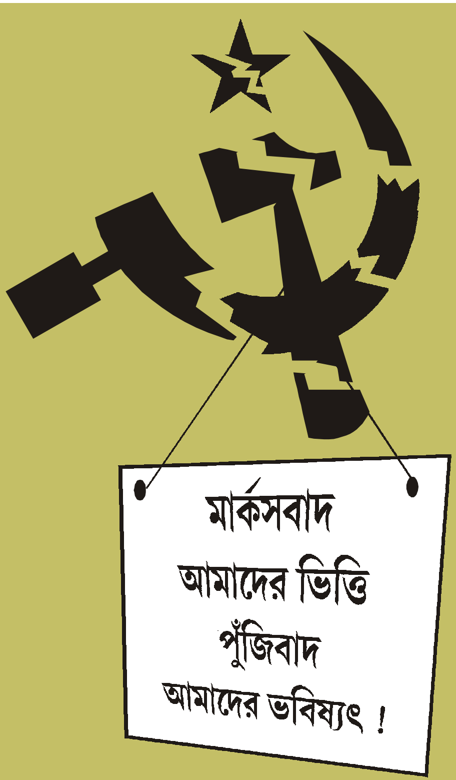

‘উন্নয়ন’- এর যাঁতাকলে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ...

‘উন্নয়ন’-এর যাঁতাকলে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ...

সূচিপত্রঃ

- পটভূমি
  এই আত্মঘাতী ‘উন্নয়ন’-এর বিরুদ্ধে আমরা। আপনি?
- পিনাকী মিত্র
  সিঙ্গুরঃ মিথ্যে বলছে সরকার
- শক্তি দাস
  সিপিএম-এর উন্নয়ন দর্শনে মার্কস(বাদ)
- অনিন্দিতা সান্যাল
  শিল্পায়নঃ ভবিষ্যতের ভিত্তিহীন স্বপ্ন

যোগাযোগঃ
পিনাকী মিত্র
✆ ০৯৮৩০৩৫৫৩৯৮
২০ বি বি বসু রোড
সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০ ০৭৫

মুদ্রকঃ
সুমুদ্রণ
৩০/১বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

বিনিময়ঃ ১০ টাকা

● পটভূমি

এই আত্মঘাতী 'উন্নয়ন'-এর বিরুদ্ধে আমরা। আপনি?

উন্নয়ন জিনিসটা কেমন একটা গোলমেলে হয়ে গেছে। হ য ব র ল-র মতো। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। উন্নয়ন শব্দের মানেটা কেমন একটা গুলিয়ে যাচ্ছে যেন। শিল্পায়ন মানেই উন্নয়ন! বিশ্বায়ন মানেই উন্নয়ন! আর জোর করে জমি, জীবিকা থেকে কৃষক-ক্ষেতমজুর উচ্ছেদের বিরোধিতা করার অর্থ নাকি উন্নয়ন বিরোধিতা।

দেশ বা সমাজের উন্নয়ন মানে একটা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা ছিল। যারা খেতে পায় না তারা খেতে পাবে; সবাই মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে; সর্বজনীন শিক্ষার মান বাড়বে— শিক্ষার সুযোগ যাবে একদম নীচতলা পর্যন্ত; অসুখ করলে পয়সা থাক বা না থাক সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে; মানুষের কাজের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে; সমাজের ভিতর বৈষম্য রাতারাতি ঘুচে না গেলেও তা কমবে, কমতে থাকবে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু চোখের সামনে, দিনদুপুরে পুকুর চুরির মতো, উন্নয়নের এই অন্তরাত্মাও চুরি হয়ে গেল। যে কলকাতা শহর একদিন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিল, সেখানে এখন খালপাড় থেকে 'বেআইনি' ঘর তুলে দেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের পঞ্চাশ বছরের রেলকলোনি বুলডোজারে, পেলোডারে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে আদালত, আর 'বাম' সরকার তা পালন করছে। কৃষকদের জমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে, জোর করে কেড়ে নিয়ে সেই বাম সরকার তা তুলে দিচ্ছে টাটার হাতে। রাজারহাট যত নিঃশব্দে উধাও হয়েছিল, তত সহজে সিঙ্গুর উচ্ছেদ হল না বলে সরকার-প্রশাসন-আমলাতন্ত্র ট্যাকটিকাল মিসটেক-গুলো নিয়ে রিভিউ করছে; শপিং মলের আলোর ঝলকানিতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে শেয়ালদা বা শ্যামবাজারের ফুটপাথ ঘেঁষা বিবর্ণ মুখের মিছিল— এসবের মানে নাকি আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে!

আমরা জানছি, আমরা দেখছি— অত্যাধুনিক নগরায়ন, অত্যাধুনিক শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটা এমনই। গরিব মানুষকে ভয় দেখিয়ে গায়ের জোরে বা মাথায় হাত বুলিয়ে তাড়িয়ে, শিল্পপতি বা প্রমোটারের হাতে একরের পর একর জমি তুলে দিতে হবে। যে ক্ষেতমজুর আইনি অধিকারে একদিন বর্গাদার হয়েছিল, তাকে এবারে ঠেলে দিতে হবে

ঠিকাশ্রমিক বা বাবুর বাড়ির ঝি-চাকর হওয়ার দিকে। এ এক অদ্ভুত উন্নয়নের হাওয়া! এ উন্নয়ন সত্যিই কার জন্য? উন্নয়নের মাপকাঠিগুলোই বা কী? আমরা উত্তর চাই— সরকারের কাছে, প্রশাসনের কাছে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে, আমলাতন্ত্র, প্রচারমাধ্যম এবং আদালতের কাছেও।

পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনও সরকারি হাসপাতালে যারা চিকিৎসার জন্য যান, তাদের অভিজ্ঞতা নিদারুণ। হতদরিদ্র মানুষের উপায় নেই, কিন্তু মধ্যবিত্ত তার সঞ্চয়ের শেষ কড়িটুকু দিয়ে বেসরকারি চিকিৎসার দানবীয় লাভ আর লোভের কোপে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়। কলকাতা শহরজুড়ে এখন ঝাঁ-চকচকে, কেতাদুরস্ত বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের ছড়াছড়ি। হাতে যাদের অঢেল পয়সা নেই, স্বাস্থ্য নিয়ে তারা আতঙ্কে দিন কাটায়। বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে কী যে হবে— গরিব বা মধ্যবিত্তের কাছে তা চরম উদ্বেগের বিষয়। শিক্ষাও তাই— স্কুল বানানো এখন দারুণ লাভজনক। টাকা দাও, বিদ্যা নাও। উন্নততর বিদ্যা মানে সাধারণত উন্নত দামের পণ্য। উন্নততর চিকিৎসা মানেও তাই। উন্নয়নের হাওয়া সেদিকেই ধায়, যেদিকে পয়সা আছে। ছিটেফোঁটা ছিটকে-ছাটকে এদিক ওদিক যায় না এমন নয়— কিন্তু তা আর কতটুকু! এই এলিট সমাজের উন্নয়নকেই সামাজিক উন্নয়ন বলে চালানো হচ্ছে।

শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে গরিবের দশা যত বেহালই হোক— আমাদের মেধার কদর বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। বিশ্বায়নী যুগেও যথারীতি মেধার রমরমা। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। বরাবরই খেটে-খাওয়া মানুষ খেটে মরে— আর মেধাবীরা ক্ষীর খায়। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলোও শেষপর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হতে পারেনি। গান্ধি-মার্কস-রমা রঁলা-রবীন্দ্রনাথ-চে-লেনিন-মাও-নেতাজিরা যে স্বপ্নই দেখুন না কেন, দেখান না কেন, সমাজে খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর মেধাবীর দাদাগিরি চলছে তো চলছেই। মেধা জুড়ে থাকে ক্ষমতা আর সম্পত্তির পায়ে বুদ্ধিমানের মতো। তবু 'বোকা'রা স্বপ্ন দেখে আজও। বোকা বুড়োর পাহাড় ঠেলার মতোই কেউ কেউ প্রশ্ন করে— বড়লোকের উন্নয়ন দিয়ে কী হবে গরীব-মধ্যবিত্তের? গোটা কলকাতা শহরও যদি দামী ফ্ল্যাটবাড়িতে ভরে যায়— সেখানে কি শহরের গরিব মানুষদের ঠাঁই হবে? যদি না হয় তাহলে কাদের জন্য এই উন্নয়ন?

বামফ্রন্ট সরকার নির্লজ্জের মতো বিশ্বায়নী চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ভাঙড়— গায়ের জোরে বা ভুল বুঝিয়ে বা ভয় দেখিয়ে হাজার হাজার কৃষিনির্ভর মানুষের ভবিষ্যৎকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অনিশ্চয়তায়। ওই জমি থেকে কুখ্যাত সালেম বা প্রখ্যাত টাটারা কোটি কোটি টাকার মুনাফা নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ছিটেফোঁটা আমাদের হাতে আসবে হয়ত— কিন্তু এর নাম আর যাই হোক— উন্নয়ন নয়। এর নাম অধঃপতন।

বিশ্বায়নী নীতির এই উন্নয়ন মডেলকে চ্যালেঞ্জ করার সময় এসেছে। এই এলিট বা বড়লোকের উন্নয়নের চরিত্রটা বোঝার এবং অন্যকে বোঝানোরও সময় এসেছে। সময় এসেছে প্রতিবাদেরও। আমরা যারা দল করি, দল করি না— আমরা সবাই— আসুন— আমাদের প্রতিবাদগুলোর মধ্যে যথাসম্ভব যোগাযোগ-ঘনিষ্ঠতা তৈরি করি। বুদ্ধিমানেরা

যে শিক্ষাই দিক আমাদের, আমরা বোকারা আজও বিশ্বাস করি, সংঘবদ্ধ ধাক্কাই পারে অচলায়তনকে ভেঙে দিতে। যেমন করে বোকা বুড়োরা অতীতে অনেকবার পাহাড় সরিয়েছিল।

কিন্তু এই অচলায়তনকে ডিঙিয়ে যাওয়ার রাস্তা কী, এনিয়ে পৃথিবী জুড়ে বিভ্রান্তি বেড়েছে। বিশেষত 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলোর অভিজ্ঞতা একটা বড় মাত্রা যোগ করেছে এই বিভ্রান্তিতে। উল্টোদিকে এই বিভ্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে যা চলছে, তা হল শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে চিরকালীন মৌলিক প্রশ্নগুলোকে হাস্যকর বানানোর চেষ্টা। কনসেপ্ট অফ ইকুয়ালিটিকে অবাস্তব দিবাস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়ে যা হচ্ছে, তা হল পুঁজির নিয়ন্ত্রণকে অ্যাবসোলিউট বলে প্রতিষ্ঠা করা। খুবই দুঃখজনক এবং বিপজ্জনক যে, বিভ্রান্ত বাম ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদেরও একটা বড় অংশ এই বিশ্বায়নী ঢেউয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন।

এর অপর কথাগুলো বলার দরকার। একইসঙ্গে মানুষের অধিকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আছেন যারা, সমাজের সেই তুলনামূলক সুবিধেপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যেও একটা যোগসূত্র তৈরি হওয়া জরুরি। আদানপ্রদান জরুরি। মত বিনিময় জরুরি। এই অনুভূতি থেকেই আমাদের এই সংকলন। ১৯৯৭ সালে কলকাতায় হকার উচ্ছেদ দিয়ে যা চলতে শুরু করেছিল, তারপর খালপাড় উচ্ছেদ রেলকলোনি উচ্ছেদের রাস্তা পেরিয়ে সেই দানব পে-লোডার এখন শিল্পায়নের নামে কৃষক উচ্ছেদেও নেমে পড়েছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম হরিপুর ভাঙড় বীরশিবপুরে কোন উন্নয়ন ধাবিত হয়ে আসছে, তা জানার চেষ্টা করছেন অনেকেই। যেটুকু জানছেন, বুঝছেন, তা জানানোরও প্রয়োজন বোধ করছেন। এমনই তিনটে লেখা নিয়ে এই সংকলন। প্রথম দুটো লেখা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক। তৃতীয় লেখাটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন নীতিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা পড়বেন, তাঁরা পক্ষে বিপক্ষে মতামত দিলে ভবিষ্যতেও আদানপ্রদানের রাস্তা খোলা রইল।

● পিনাকী মিত্র

সিঙ্গুরঃ মিথ্যে বলছে সরকার

একটা বিভ্রান্তিকর সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিগত কয়েক মাস যেন আমাদের শান্ত পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। ঘন ঘন বনধ্, পথ অবরোধ, মিছিল, অনশন, অবস্থান, সেমিনার, কনভেনশন, পথসভা—সব মিলিয়ে যেন এক নৈরাজ্যের পরিস্থিতি। অথচ সামনে কোনও নির্বাচনও নেই। এই পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা যেন ঠিক অভ্যস্ত নই। আমাদের নিরুপদ্রব জীবনযাপন, শেয়ারবাজার অথবা সৌরভ গাঙ্গুলির উত্থান-পতনের টেনশন, সালেম-টাটা-জিন্দালদের হাজার হাজার কোটি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি প্রসূত নিরাপত্তা, রাজারহাট অথবা বাইপাশের ঝাঁ চকচকে স্কাই রাইজ, শপিং মল, মেট্রোর এক্সটেনশন, খালপাড়ের সংস্কার, নিত্য নতুন ফ্লাইওভার আর সর্বোপরি আমাদের উন্নয়নমুখী মুখ্যমন্ত্রীর পুঁজি অভিমুখী ক্লান্তিহীন উদ্যোগ আমাদের তো দিব্যি রেখেছিল। আমরা সবে ভাবতে শুরু করেছিলাম— এই তো হচ্ছে! আমাদের সন্তানরা আই টি সেক্টরে শুরুতেই ৩০ হাজার টাকার চাকরি পাচ্ছে। দশ-বিশটা পাশাপাশি ফ্ল্যাটের মধ্যে একটার ছেলে বা মেয়ে বিদেশে যাচ্ছে চাকরি অথবা গবেষণায়। কমে যাচ্ছে গাড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল এর দাম। বেড়ে যাচ্ছে জয়েন্টে চান্স পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, বেড়ে যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ। সর্বত্র একটা খুশির পরিবেশ যেন। শিল্পায়ন, উন্নয়ন এগুলো যেন আর শুধুমাত্র অন্য রাজ্যের ব্যাপার নয়। কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধিতা নেই, নেই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ; আর সে কারণে নেই আমাদের এতদিনের পিছিয়ে পড়াও। এখন শুধু সামনে তাকানোর স্বপ্ন। কল্লোলিনী, তিলোত্তমা হয়ে ওঠার স্বপ্ন।

বেশ চলছিল স্বপ্ন দেখা। কিন্তু হঠাৎ-ই এই স্বপ্নের সামনে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠল একটা নাম— সিঙ্গুর। কেউ কেউ বলে উঠল—'অনেক হয়েছে। বন্ধ করো তোমাদের এই উন্নয়ন-এর তামাশা। এর নাম উন্নয়ন নয়। যে শিল্পায়ন-এর স্বপ্ন তোমরা দেখাচ্ছো তা আসলে একটা ধাপ্পাবাজি। পৃথিবীর বহু জায়গায় এর মধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে এই শিল্পায়ন মডেল। এ শিল্পায়ন আসলে নিঃস্বায়ন। মানুষকে নিঃস্ব করে দেওয়ার চক্রান্ত।'

সাথে সাথে ভেসে উঠল অনেকগুলো বিপন্ন মুখ। সিঙ্গুরে ঘিরে দেওয়া জমির খুঁটি

ধরে কান্নায় ভেঙে পড়া কৃষকের ছবি। আর পাশাপাশি প্রতিবাদ উঠতে শুরু করল সমাজের সেইসব অংশ থেকেও যাদের জমি হারাতে হয়নি, জীবিকা হারাতে হয়নি, বরং তথাকথিত উন্নয়নের হাত ধরে যাদের স্বদেশে বা বিদেশে স্বপ্নের কেরিয়ার গড়ার হাতছানি রয়েছে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, শিবপুর, প্রেসিডেন্সি, মেডিক্যাল কলেজ, জে এন ইউ-এর ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবাদে নামলেন। সাধারণ মানুষ এবং লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের বর্তমান কাঠামোটাকে। যে প্রশ্নের উত্থাপন হল সিঙ্গুর থেকে। আর তাপসী মালিকের জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া দেহ থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়ায় ভেসে ভেসে সেইসব প্রশ্ন পৌঁছে গেল হরিপুর থেকে নন্দীগ্রাম, বারুইপুর থেকে রাজারহাট অথবা ভাঙড়-এর সবুজ জমিতে।

নাঃ! আর সাহিত্য নয়। সুললিত গদ্যের সীমানা পেরিয়ে বরং নেমে পড়া যাক যুক্তি এবং তথ্যের কঠিন মাটিতে। দেখে নেওয়া যাক কী কী প্রশ্নে বিতর্ক চলছে সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে। কী বলছে সরকার? বিরোধী যুক্তিই বা কী? সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা মানেই কি শিল্পের বিরোধিতা? নাকি সমস্যাটা সরকারের শিল্পায়ন নীতিতেই? সরকার চালায় যে শাসক দল— তাদের রাজনীতিই বা এই প্রশ্নে কী বলছে? সেখানেও কি রয়েছে আত্মসমর্পণকারী গতিমুখ? আসুন এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক!

সরকার বিভিন্ন সময়ে সিঙ্গুর নিয়ে যে প্রচার বা দাবি করেছে, তার ভিত্তিতেই মূল ছ-টা ভাগে আমরা এই প্রাথমিক আলোচনাটাকে ভাগ করছি—

(ক) সিঙ্গুরে জমির চরিত্র
(খ) জমি অধিগ্রহণ এবং কৃষকদের সম্মতি
(গ) জমি অধিগ্রহণের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি
(ঘ) নজিরবিহীন ক্ষতিপূরণ
(ঙ) কর্মসংস্থান এবং শ্রমদিবস বৃদ্ধি
(চ) সিঙ্গুর কাদের আন্দোলন

(ক) সিঙ্গুরে জমির চরিত্রঃ

সরকার যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে দেখানো হয়েছে, সিঙ্গুরে অধিগৃহীত জমির ৯০·২৮% একফসলি। কিন্তু চোরের মতো যা চেপে যাওয়া হয়েছে, তা হল এই হিসেবটা ১৯৭৮ সালের। অর্থাৎ বামফ্রন্ট এরাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার ঠিক পরের বছরের। তারপর সিঙ্গুরে ডিপ টিউবওয়েল বসেছে, খাল সংস্কার হয়েছে—অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে। বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির মানও সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। তাই যে জমি প্রায় ৩০ বছর আগে, ১৯৭৮ সালে, একফসলি ছিল তা বহুফসলি হয়ে উঠেছে—এটা ভেবে নেওয়ার জন্য কোনও বাড়তি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

এছাড়াও, সরকারি স্ট্যাটাস রিপোর্টের তথ্যমতো যদি ১৯৭৮-এর জমির চরিত্র ২০০৬ সালেও একই অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে তো বামফ্রন্ট সরকারেরই মুখ লুকোনোর জায়গা থাকে না। ভূমিসংস্কার, কৃষি উৎপাদন নিয়ে এত বাগাড়ম্বরের দশাটা কী হবে ভাবুন! আসলে কৃষিতে বাস্তবের তুলনায় বেশি সাফল্য প্রমাণ করতে যেমন তথ্যের মারপ্যাঁচ চালানো হয়, কৃষিজমি কেড়ে টাটাকে উপহার দিতে গিয়েও সেই একই মারপ্যাঁচ। মিথ্যের মারপ্যাঁচে এভাবেই জড়িয়ে পড়ছে সরকার।

সিঙ্গুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে— ওখানে অধিকাংশ জমিই তিন থেকে চারফসলি। কিছু কিছু জমিতে এমনকি পাঁচ বা ছ-টা ফসলও হয়। সিঙ্গুরে উর্বর মাটিতে চাষ হয় ধান, আলু, ছোলা, সর্ষে, পাট, গম। ২০০৪ সালের হুগলি ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিকাল হ্যান্ডবুকে দেখা যাচ্ছে গোটা সিঙ্গুরে মোট কৃষিজমি ১০,৪৩৭ হেক্টর। তার মধ্যে বহুফসলি জমির পরিমাণ ৯০৯৯ হেক্টর। মাত্র ৪৩৮ হেক্টর জমি একফসলি। যে পাঁচটা মৌজা ধরে টানাটানি করছে সরকার, তার জমিচরিত্র সিঙ্গুরের গড়পরতা চরিত্রের থেকে ভীষণ নিম্নমানের— এমন দাবি সরকারও কোথাও করেনি। আর সে তথ্য যদি হাতে থাকত, তবে ১৯৭৮-এর তথ্যকে এখনকার বলে চালাবার চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করতে হত না সরকারকে।

(খ) জমি অধিগ্রহণ এবং কৃষকদের সম্মতি

ভয়ঙ্কর সরকারি মিথ্যাচার আর সি পি এমের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার ছবিটা বেরিয়ে এসেছে সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণকে ঘিরে। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল, 'সরকার জোর করে কিছু করছে না'। খোদ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এ রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় যাওয়া 'বহিরাগত' পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি প্রত্যেকেই বারবার বলেছেন, কৃষকদের সম্মতি নিয়েই সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে। ২ ডিসেম্বর ২০০৬ কৃষকদের লাঠি পেটানোর পরও একই কথা বলে যাচ্ছিলেন বুদ্ধবাবুরা। বলা হচ্ছিল, ৯৯৭ এককের মধ্যে ৯৫২ একরের জমি মালিকই স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন। একদম গোয়েবেলসীয় ঢঙে সরকার এবং বন্ধু প্রচারমাধ্যমগুলো এই ৯৫২ সংখ্যাটাকে আকাশে-বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু সরকারের প্রথম স্ট্যাটাস রিপোর্টেই এই ভাঁওতাবাজি প্রকাশ হয়েছিল। প্রমাণ হল দ্বিতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্ট বেরোনোর পর। এই প্রমাণকে আরও জোরদার করল প্রায় সাড়ে তিনশ একর জমি মালিকদের আদালতে হলফনামা পেশ—

'না, আমরা আমাদের জমি অধিগ্রহণে সম্মতি দিইনি।'

এবার উল্টো করে ব্যাপারটা দেখা যাক। কেউ সরকারকে জমি দিয়েছেন, এটা কীভাবে বোঝা যাবে? এক— সেই কৃষকের স্বাক্ষরিত সম্মতিপত্র অথবা দুই—জমির দাম বাবদ চেক গ্রহণ করা। যদিও স্বেচ্ছায় দিয়েছেন না বাধ্য হয়ে দিয়েছেন— এ প্রশ্নটা থেকে যাবে। সিঙ্গুরের আন্দোলনকারীদের দাবি, যারা জমি বেচে দিয়েছেন, তাদের

অধিকাংশই তা করেছেন চাপের মুখে, ভয় পেয়ে, ‘চেক না নিলে, জমিও গেল টাকাও গেল’— এসব কৌশলী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে। তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, যারা জমির জন্য চেক নিয়েছেন এমন সংখ্যাটা কত? সরকারের প্রথম স্ট্যাটাস রিপোর্টের হিসেবটা দেখুন :

২ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত

- জমির জন্য মোট ধার্য দাম .... ১৩১·৪৯ কোটি টাকা
- জমির মালিকরা নিয়েছেন .... ৭৬·৬৪ কোটি টাকা
- জমি মালিকরা নেননি .... ৫৪·৮৫ কোটি টাকা

Land Acquisition compensation:

Total compensation payable: Rs. 131.49 crore

Mouza	LA Compensation Total (Rs. in Lakh)	Bargadars Total (Rs. in Lakh)	Total (Rs. in Lakh)
Beraberi	4,148.84	24.61	4,173.45
Khaserbheri	3,765.90	11.81	3,777.71
Singherbheri	743.34	1.85	745.19
Bajemelia	429.88	2.13	432.02
Gopalnagar	3,997.02	23.58	4,020.60
Total	13,084.98	63.99	13,148.96

Disbursement till 2nd December 2006: Rs. 76.64 Crore

Number of persons to whom disbursement has been made: 9020

Area of land in respect of which payment has been made: 635 acres

Bargadars who has received payment: 88

Compensation amount disbursed to recorded bargadars: Rs. 17 lakh

Total Disbursement yet to be made: Rs.54.85 Crore

Persons yet to receive payment: 3000 (approx)

Consent Status:

Pre award:
Raiyati consent: 548 acre
Factory consent: 38 acre
Vested Land: 34 acre

Total: 620 acre

Post award consent till 4th December 2006: 332 acre

Total consent till 4th December 2006: 952 acres

সরকারি স্ট্যাটাস রিপোর্ট: দেওয়া নেওয়ার হিসেব

- টাটার জন্য মোট জমি .... ৯৯৭ একর
- যে পরিমাণ জমির দাম নিয়েছেন জমি মালিকরা .... ৬৩৫ একর
- যে পরিমাণ জমির দাম নেননি মালিকরা............................. ৩৬২ একর

অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ৩৬২ একর জমির মালিক সরকারের দেওয়া চেক নেননি। অথচ ঐ স্ট্যাটাস রিপোর্টেই লেখা হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত ৯৫২ একর জমির মালিকই জমি দিতে সম্মত হয়েছেন। সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু টাকা নেননি! যেন টাটাদেবকে সিঙ্গুরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃষকদের প্রণামি দান! আর কী হতে পারে এছাড়া? সরকারি তথ্য মানলে?

কিন্তু ঝুলির আসল বেড়ালটা বেরিয়ে পড়েছে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ সিঙ্গুরের দ্বিতীয় স্ট্যাটাস রিপোর্টটা বেরোনোর পর। সেখানে ‘সম্মতিদান বলতে কী বোঝায়?’ এই অংশে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ‘জমি অধিগ্রহণ আইন’—এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী সরকার কোনও জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে জমি মালিকের সম্মতি জানানোর কোনো অধিকারই নেই এবং অধিগ্রহণের জন্য সেটা আবশ্যিক নয়। এজন্য কোনো ফর্মও নেই। জমি অধিগ্রহণের নোটিস জারি হওয়ার এক মাসের মধ্যে লিখিত ‘অবজেকশন’ বা বিরোধিতা জানানো যেতে পারে। তাহলেও তার মানে এটা দাঁড়ায় না যে অধিগ্রহণ হবে না। এই সম্মতিদানের অধিকার না থাকার বিষয়টি কি সরকার জানতেন না? তাহলে কেন দিনের পর দিন এই মিথ্যাচার করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যে—‘৯৫২ একর জমির লিখিত সম্মতি পাওয়া গেছে?’ এরপর ১১(২) ধারায় বলা হচ্ছে সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নোটিস দিলে জমির মালিক ক্ষতিপূরণ নেবে কিনা সেটা একটা ফর্ম পূরণ করে জানাতে হবে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে এই ফর্ম পূরণ জমি দানের সম্মতি হিসেবে দেখা হচ্ছে (যদিও ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মতি জানানো আর জমি দানের সম্মতি জানানো এক ব্যাপার নয়) তা হলে সরকারি বয়ান অনুযায়ী এই ৯৫২ একর জমির মালিকের ক্ষতিপূরণ নেওয়ার সম্মতিপত্র সরকারের কাছে থাকা উচিত। কোথায় সেইসব ফর্ম? ঐ পূরণ করা ফর্মগুলোকে কি এত দিনেও সংবাদিকদের দেখানো যেত না?

সবার শেষে যে প্রশ্নটা ওঠে এবং উঠছে তা হল ব্রিটিশ আমলে তৈরি এবং পরে অল্পসল্প সংযোজিত একটা কালা আইন—যা কৃষকের সম্মতি ছাড়াই তাকে উচ্ছেদ করতে পারে— সে আইনেই কিনা বামফ্রন্টকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ হাসিল করতে হল? এত দেরিতে এসব স্বীকার করতে গেলেন কেন কমরেড? আগে বললেই হত!!

(গ) জমি অধিগ্রহণের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

সরকারের দাবি, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের গোটা প্রক্রিয়াটাই হয়েছে গণতান্ত্রিক উপায়ে। সর্বদলীয় মিটিং করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক

হয়েছে। আর আলাপ আলোচনা করেই নাকি জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারের এই দাবিকে চরম মিথ্যাচার বলা যাবে না একেবারেই। ২০০৬-এর ২৭ মে থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মাস চারেকে গোটা নয়েক বৈঠক হয়েছে বা বৈঠক

ANNEXURE II: Discussion with Local People's Representatives

Chronological History of Meetings:

Date	Details	Venue	Outcome
27th May 2006	DM's First all political Party meeting	*DM's office*	
17th June 2006	DM's second all political Party meeting	*DM's office*	
4th July 2006	DM's third all political Party meeting	*DM's office*	
27th August 2006	DM's meeting with the leadership of "*Krishi Jami Bachao Samity*" under leadership of Sri Becharam Manna and six others	*DM's Bungalow*	No decision transpired
5th September 2006	DM's meeting with all three Gram Panchayet Pradhans and Members	*DM's office*	Panchayet members of the other political parties did not attend.
13th /14th September 2006	MD WBIDC, Director Industry, DM and SP's meeting with Sri Becharam Manna	*Singur Police Station*	No decision transpired
14th September 2006	MD WBIDC, Director Industry's informal meeting with Sri Dudhkumar Dhara and Sri Mahadeb Das	*A private house in Kolkata*	No decision transpired
19th September 2006	MD WBIDC's second meeting with Sri Dudhkumar Dhara and Sri Mahadeb Das	*A private house in Kolkata*	No decision transpired
21st September 2006	MD WBIDC, Director Industry's meeting with MLA Singur	*Singur Block office*	MLA Singur was requested to identify the plots which in his opinion should have been classified for higher compensation to facilitate enquiry and decision , but no response received from him.

সরকারি স্ট্যাটাস রিপোর্ট: সিদ্ধান্তের আগে আলাপ-আলোচনার হাল

ডাকা হয়েছে।

সরকারি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে প্রথমেই তিনটে সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে হুগলি জেলাশাসকের দফতরে। কী আলোচনা হয়েছে সেখানে? কী সিদ্ধান্ত হয়েছে? কোনও উল্লেখ নেই! ২৭ অগাস্ট ২০০৬ চতুর্থ বৈঠকটা হয়েছে জেলাশাসকের বাংলোয়। কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির নেতারা বৈঠকে ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সিদ্ধান্ত বেরোয়নি। ৫ সেপ্টেম্বর গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানদের ডি এম অফিসের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। সরকার জানাচ্ছে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পঞ্চায়েত সদস্যরা আসেননি (অন্যান্য দল বলতে বোধহয় অ-সিপিএম বা অ-বামফ্রন্ট দলগুলোকেই বোঝানো হয়েছে)। এরপর পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের এম ডি কখনও সিঙ্গুরে, কখনও কলকাতায় বৈঠক করেন কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি নেতাদের সঙ্গে। কিন্তু সেসব বৈঠকেও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। ২১ সেপ্টেম্বর বৈঠক হল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিধায়ককে বলা হল কোন্ কোন্ জমিতে বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত— সে বিষয়ে আপনার মতামত জানান! স্বভাবতই তিনি এমন মতামত জানাতে রাজি হননি।

জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন যে বিধায়ক, তাকে বলা হল ক্ষতিপূরণ নিয়ে মতামত দিতে! মতামত দিলেন না, ফলে বৈঠকও এগোল না। চার মাসে ন-টা বৈঠক সিদ্ধান্তহীন। অথচ সিদ্ধান্ত হয়ে গেল জমি অধিগ্রহণের! এসবই নাকি গণতন্ত্র। আর এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই জমি অধিগ্রহণের নোটিশ পড়ে গেল সিঙ্গুরে। তারপর পৌঁছে গেল বাম-গণতন্ত্রের লাঠি। এসবই এখন সবাই জানেন। কিন্তু সি পি এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের কনসেপ্ট অফ ডেমোক্র্যাসিটা কেমন বুঝলেন তো?

(ঘ) নজিরবিহীন ক্ষতিপূরণ :

এই বাগাড়ম্বর শুনে শুনে সাধারণ মানুষ বোর হয়ে গেছেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণটি শাসক দল দু'ভাবে ব্যবহার করছে—প্রথমত, তাঁরা প্রমাণ করতে চাইছেন গোটা ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের জন্য নানা জায়গায় যা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি দিচ্ছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বা কৃষকের স্বার্থ তাঁরাই সবচেয়ে বেশি দেখেন। এই যুক্তিটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চাইছেন সিঙ্গুরের জমিচ্যুত এবং জীবিকাচ্যুত মানুষের ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই অনিশ্চিত হবে না। ঐসব মানুষের কেউ যদি টাটাদের কারখানায় চাকরি নাও পায় তাহলেও ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যাঙ্কের রাখলে প্রতিমাসে সুদবাবদ তাঁর আয় কৃষির তুলনায় বেশি হবে। কিন্তু উপরোক্ত বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত?

প্রথমত, বেসিক প্রাইস মানেই বাজারদর নয়। যে-কোনো জমির সরকার নির্ধারিত একটা ভ্যালুয়েশন হয়। কিন্তু সেই দামেই কি বাজারে বেচা-কেনা হয়? সাধারণভাবে

সেই বেচাকেনা চলে অনেকটাই বেশি দরে। এটা সাধারণ মানুষ যাঁরা জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট কখনো কিনেছেন বা বেচেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। ঐ কৃষকরা যদি স্বেচ্ছায় নিজের জমিটা অন্য কোনো ইচ্ছুক ক্রেতাকে বেচে দিতেন, তা হলে সরকার প্রদত্ত দামের চেয়ে অনেকটাই বেশি পেতেন— একথা সকলেই বোঝেন। তাছাড়া ওখানে যদি কারখানা হয়, তখন ঐ জমির দাম যে পরিমাণে বাড়বে, তাতে এখন জমি দিতে বাধ্য হওয়া কৃষক যে অনেকখানিই বঞ্চিত হচ্ছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, সরকারি স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুযায়ী মোট নথিভুক্ত বর্গাদার ২৩৭ জন এবং অনথিভুক্ত প্রায় ১৭০ জন। যদিও সিঙ্গুরে সমীক্ষারত কর্মীদের মতে অনথিভুক্তের সংখ্যা আরও অনেকটাই বেশি। তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই প্রায় ৪০০ জন (২৩৭+১৭০=৪০৭) বর্গাদার, তাহলে তাঁরা মোট ক্ষতিপূরণ কত পাচ্ছেন? সরকারি হিসেব মতো ৬৩·৯৯ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ প্রায় ৬৪ লক্ষ। প্রতি বর্গাদার গড়ে কত টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন? মাত্র ১৬০০০ টাকা কোন্ 'ক্ষতি' ঐ ১৬০০০ টাকা 'পূরণ' করতে পারবে বলে ভাবছেন সরকারি কর্তাব্যক্তিরা? অথচ এই কথাটাই গোটা ভারতবর্ষে তাঁরা বুক বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন এবং 'প্রগতিশীল' সাজছেন। পোস্ট অফিসে ১৬০০০ টাকা জমা রাখলে বার্ষিক ৮% সুদের হারে মাসিক আয় কত হবে? ১০৬ টাকা ৬৭ পয়সা। যদি ঐ ৪০০ বর্গাদারের একজনও টাটা বা তাঁদের অনুসারী শিল্পে কাজ না পান তাহলে তাঁর কি হবে একবারও ভেবে দেখেন ক্ষতিপূরণ বাগড়ম্বরকারীরা?

তৃতীয়ত, যে আলোচনাটা একবারও উঠছে না তা হল ওই এলাকার ক্ষেতমজুরদের কী হবে? সিঙ্গুরের উচ্চফলনশীল কৃষিজমির ওপর নির্ভর করে থাকে প্রচুর সংখ্যক ক্ষেতমজুরের জীবন। সেই ক্ষেতমজুররা শুধুমাত্র সিঙ্গুর-এর অধিবাসী তা-ই নয়, সিঙ্গুরের বাইরে থেকেও ওই এলাকায় কাজ করতে আসেন প্রচুর সংখ্যায় ক্ষেতমজুর। এই কৃষিমজুররা যদি সত্যিই টাটার কারখানা বা অন্য কোথাও স্থায়ী শ্রমিক হয়ে উঠতে পারেন, অন্য কথা ছিল। কিন্তু তা তো হবে না। সরকার এদের সম্পর্কে কী ভাবছে সেটাও পরিষ্কার নয়। সরকার মানে, যার ক্ষমতায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)। কমিউনিস্ট পার্টি—মানে সর্বহারার অগ্রণী বাহিনী— অথচ কৃষি সর্বহারাদের সিঙ্গুরে কী হবে, সেটাই এখানে সবথেকে ব্রাত্য বিষয়।

ক্ষতিপূরণ নিয়ে যাদের এত বাগাড়ম্বর, সেই সিপিএম বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ পর্যন্ত কোনও ক্ষতিপূরণ নীতিও নেই। দশ বছর আগে ১৯৯৭ সালে হকার উচ্ছেদ, তারপর একে একে ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি বেআইনি অধিগ্রহণ বলে উচ্ছেদ হল। এবার সিঙ্গুরে আইনি জমিমালিকদেরও উচ্ছেদ করা হল। উচ্ছেদের পর মানুষ কোথায় যাবে, কী খাবে, এসব ভাবনার দায়দায়িত্ব নেই সরকারের। অথচ এই দেশেই কিছু অকমিউনিস্ট সরকার, কংগ্রেস বা এন ডি এ পরিচালিত সরকার ক্ষতিপূরণ নীতি নিচ্ছে। সে নীতি হয়ত চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা, তবুও চক্ষু লজ্জার খাতিরেই তা নিচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সেই চক্ষুলজ্জাও নেই। পুনর্বাসন নীতিটাই নেই।

(৬) টাটা কারখানায় কর্মসংস্থান— শ্রমদিবস

কর্মসংস্থান, শ্রমদিবস— এ বিষয়দুটো আমরা এই পুস্তিকাতেই অন্য দুটো লেখায় বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করেছি। তবে সিঙ্গুরের স্ট্যাটাস রিপোর্টে যে কর্মসংস্থান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা বেশ কৌতুককর। সরকারি হিসেব মতো অধিগৃহীত জমির মালিক এবং নথিভুক্ত-অনথিভুক্ত বর্গাদারের মোট সংখ্যাটা প্রায় দশ হাজার। এর বাইরে আছেন ক্ষেতমজুররা। সিঙ্গুরে বসবাসকারী ক্ষেতমজুররা তো আছেনই, আছেন বাইরে থেকে সিঙ্গুরে কাজ করতে আসা ক্ষেতমজুররাও— যারা কাজ হারাচ্ছেন। সংখ্যাটা কত? কী

Rehabilitation and Training Program at Singur

WBIDC camp office:

The camp office has been opened on 11th October 2006. The office is located within the acquired land. Till 2nd December 1372 landlosers and 443 landless workers have been enrolled in the office with details as under:

Category	Total	Men	Women
Landlosers	1372	1050	322
Landless workers	443	405	38

Training programs initiated:

Belur Math Ramkrishna Shilpa Mandir

179 landlosers are undergoing training at Belur Math Ramkrishna Shilpa Mandir in the following trades:

Trade	No of Trainees
Machinist	42
Welding	31
Two & Three Wheeler Repairing	2
Automobile Repairing	77
House Wiring & Electrical Gadget Repairing	27
Total	179

The total training program is of four months duration. In the second phase of the training program, another 180 landlosers would be sent for training of which 146 would be graduate. [3]

Other Training:

In addition to above program steps have been taken to start the following programs. [4]

Trade	No of Trainees	Training Agency	Starting date
Tailoring	40(women in 2 batches)	Singer India Ltd (duration : 6 months)	6th December 2006
Catering	25 (women)	Institute of Hotel Management Catering, Technology & Applied Nutrition (duration: 4 weeks	19th December 2006
Mason	40 (landless labourers)	CII (ER) (through its members)	
Machinist	10	CII (ER) (through its members)	
Security guard	60 (in 3 batches)	G4/ Security Agency	

সরকারি স্ট্যাটাস রিপোর্ট: পুনর্বাসনের রসিকতা

এদের ভবিষ্যৎ? কোনও উত্তর নেই সরকারের। প্রত্যক্ষভাবে যাদের রুজি-রুটি-কর্মসংস্থান এই জমির সঙ্গে, সরকারি হিসেবেই তার সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে দশ হাজারের ওপর। সিঙ্গুরের আন্দোলনকারীদের মতে অবশ্য এই সংখ্যা অনেক বেশি। তবু সরকারি হিসেব ধরে নিলেও, এই দশ হাজারের বেশি মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কী করেছে সরকার? স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম দফায় ১৭৯ জনকে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ শিল্প মন্দিরে পাঠানো হয়েছে মেকানিস্ট, ওয়েল্ডিং, দু-তিন-চার চাকার গাড়ি সারানো, ইলেকট্রিকের কাজ— ইত্যাদির ট্রেনিং দিতে। ২ মাসের ট্রেনিং। পরের দফায় আরও ১৮০ জনকে পাঠানো হবে। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। সিঙ্গুরের চল্লিশজন মহিলাকে টেলারিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২৫ জনকে ক্যাটরিং-এর। আরও শ-খানেক ভূমিহীনকে পাঠানো হয়েছে বা হবে সিকিউরিটি গার্ড, মেকানিস্ট ইত্যাদি হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণে। অর্থাৎ, হাজার দশেক মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের গাজর ঝোলানো ১৭৯+১৮০+৪০+২৫+১০০=৫২৪ জনের! হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান উচ্ছেদ হল। ধরে নেওয়া যায় এর একটা অংশের তাও বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা আছে। তাহলেও বাকি যে বিপুল অংশ, তার জন্য সরকার, ট্রেনিং-এর এই চোখে ধুলো দেওয়া গালগল্প খুলে বসেছে। কাজ থেকে উচ্ছেদ হওয়াদের কাল থেকে ভাত-রুটির জন্য বিকল্প রোজগারের প্রসঙ্গটা চেপে গিয়ে প্রশিক্ষণের এই হিসেবপত্তরকে রসিকতা ছাড়া আর কী বলবেন? তাছাড়া উন্নয়নের কোন্ মডেলে কৃষি-জীবিকা থেকে দারোয়ানের চাকরি নেওয়াটা অগ্রগতির লক্ষণ, সেটাও বোধহয় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কমিউনিস্ট সরকারের। বর্গাদারির অধিকার হারানো কৃষক নতুন সিঙ্গুরে টাটা কারখানার অনুসারি উন্নয়নে রাস্তার ধারে হাতুড়ি-স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসবেন, বাবুদের গাড়ি সারাবেন— সত্যিই উন্নয়ন হচ্ছে বটে রাজ্যে।

(চ) কাদের আন্দোলন

নন্দীগ্রামে প্রতিবাদ-বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পরও, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শুধুমাত্র তৃণমূল আর নকশালপন্থীদের ব্যাপার বলে চালানো হচ্ছে। এ আন্দোলনে তৃণমূল বা নকশালপন্থী দলগুলো আছে, এটা ঘটনা। নকশালপন্থী নয় এমন অনেক বামপন্থী দল, তৃণমূল নয় এমন অনেক অ-বামপন্থী দলও আন্দোলনে সামিল। সিঙ্গুর-আন্দোলনের মঞ্চে, মিছিলে এমন বহু চেনা-অচেনা মানুষ এসেছেন যাদের কোনও দলীয় পরিচিতি নেই। এমন অনেক বুদ্ধিজীবী সামিল হয়েছেন যারা কখনও সেইভাবে কোনও রাজনৈতিক সংগঠনে ছিলেন না। সর্বোপরি এই রাজনৈতিক দলগুলো বা সিঙ্গুরের বাইরের মানুষদের প্রতিবাদ আন্দোলন আদৌ কোনও ভিত্তি পেত না, যদি না সিঙ্গুরের মাটির মানুষেরা— ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা প্রতিবাদে না নামতেন। এমন গণ-চেহারার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানায় বিরল। মাঠে ময়দানে রাস্তায় নেমে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তার বাইরেও নজরে পড়ার মতো জনসমর্থন দেখা গেছে সমাজের

প্রায় সর্বস্তরে। মানুষ বিতর্ক করেছে, আলোচনা করেছে, আন্দোলনের কথা বোঝার চেষ্টা করেছে। এই যে আন্দোলনমুখী হাওয়া, এটা ভবিষ্যতে ঝড় হয়ে উঠতে পারবে কিনা তা অনেক যদি-কিন্তুর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সিঙ্গুরের গণ-আন্দোলন ভবিষ্যতে আরও বড় গণ আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে। নন্দীগ্রামের গণ বিস্ফোরণের পেছনে যেমন সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রভাব আছে, তেমনি রাজ্যের গ্রাম-গ্রামান্তর যেখানেই জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ছিল এবং আছে সেসব জায়গাতেও মানুষ নড়েচড়ে বসেছে। হরিপুর থেকে ভাঙড় তার উদাহরণ। কোনও একটা-দুটো সংগঠন নয়, নানান ধরনের সংগঠন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ এবং সমাজের বহু সংবেদনশীল মানুষের সংগঠিত-অসংগঠিত প্রতিবাদই সিঙ্গুর আন্দোলনের জোর। এই জোরটা বুঝেছেন বলেই আন্দোলন বিরোধীরা সংগঠিতভাবে এটাকে শুধুমাত্র তৃণমূল বা নকশালদের 'উন্নয়ন বিরোধী ষড়যন্ত্র' বলে লাগাতার প্রচারে নেমেছেন। সঙ্কীর্ণ দলীয় সিলমোহর লাগিয়ে, আন্দোলনের প্রতি মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

আরও একটা চেষ্টা চলছে। তা হল সংগঠনগুলোর যৌথ আন্দোলনের ভেতর ফাটল তৈরি করা। তৃণমূল কংগ্রেস বলুন বা অন্যান্য দলগুলোর যৌথ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, বা জোট রাজনীতির সম্পর্কে এদের সুস্পষ্ট নীতি এবং তার প্রয়োগ— সবক্ষেত্রেই দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা প্রকট। সিঙ্গুরকে ঘিরে একটা নতুন সম্ভাবনা দেখা গেছে। বাইরে থেকে সেই সম্ভাবনা ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, চলবেও। জোট রাজনীতির ভেতরে যদি যৌথ আন্দোলন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য না পায়, তবে এই ভেস্তে দেওয়ার কাজটা খুব সহজেই হবে। আর আন্দোলনের ময়দানে দাঁড়িয়ে যদি এই যৌথ রাজনীতি নতুন কিছু দেখাতে পারে, মানুষের সমর্থন যে বাড়বে, সিঙ্গুর আন্দোলনই তার প্রমাণ।

সিঙ্গুর আন্দোলন সম্পর্কে আরও একটা হাস্যকর অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। সিঙ্গুরে 'বহিরাগত'দের আনাগোনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কারা তুলেছে? যাদের দুই ভিনরাজ্যের পলিটব্যুরো নেতা সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা থেকে ভোট নিয়ে রাজ্যসভায় গেছেন! চে গুয়েভারার ছবি ছাপানো সিপিএমের কমরেডরা কী জানেন না, ওই লোকটা জন্মেছিলেন আর্জেন্টিনায়— বিপ্লব করেছিলেন কিউবায়, মন্ত্রীও হয়েছিলেন— তারপর বলিভিয়াকে মুক্ত করতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন বলিভিয়ারই জঙ্গলে। আন্তর্জাতিকতাবাদী দর্শনের নেমপ্লেট বুকে নিয়ে ঘোরা কমরেডরা সিঙ্গুর, হরিপুর, নন্দীগ্রামের জন্য ভিসা-পাসপোর্টের নিয়মও চালু করবেন কিনা কে জানে! কিন্তু কমরেড, রেলে চাকরি না করেও জ্যোতি বসু যে রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করতে যেতেন— সেটাও কি এবার আপনারা 'ভুল হয়ে গেছে' বলবেন?

● শক্তি দাস

সিপিএম-এর উন্নয়ন দর্শনে মার্কস(বাদ)

সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গ যখন কৃষিজমিতে বৃহৎপুঁজির শিল্প স্থাপন নিয়ে বিতর্কে উত্তাল, ঠিক সেই সময় আমাদের হাতে এলো সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্টের শিল্পনীতিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কম. বিনয় কোঙার, কম. নিরুপম সেন এবং আরও কিছু বিদগ্ধ জনের কয়েকটি প্রবন্ধ। মার্কস থেকে লেনিন— কেউই অবহেলিত হননি সেই প্রবন্ধগুলিতে। শুধু তাই নয়, ছাত্রসংগঠনের প্রচার পুস্তিকা, যুব সংগঠনের কাগজ, দলীয় মুখপত্র, ইন্টারনেট— সর্বত্রই শাসক দলের সদস্য/সমর্থকরা তাঁদের মতো করে যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করেছেন কৃষিজমি অধিগ্রহণের স্বপক্ষে। জমি অধিগ্রহণের 'মার্কসীয় ব্যাখ্যা', 'কৃষকের শ্রেণিচরিত্র', 'বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের রূপ', 'বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা'....ইত্যাদি জটিল-কঠিন বিষয় থেকে শুরু করে জমি অধিগ্রহণের বিরোধী 'দক্ষিণপন্থী' বা 'নকশালপন্থী'দের 'উন্নয়ন-বিরোধী' কর্মসূচীর সমালোচনা, তাদের শ্রেণি ভিত্তি নিয়ে টানাটানি... কী নেই তাতে? আছে বর্তমান যুগের 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ'-এর তত্ত্ব, অঙ্গরাজ্যে 'সীমিত ক্ষমতা'র মধ্যে 'বামপন্থী' সরকার টিকিয়ে রাখার ঐতিহাসিক 'দায়িত্ব ও কর্তব্য'-এর প্রশ্ন ... ইত্যাদি নানাকিছু। মোটকথা, বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন রকম ভাবে ও ভঙ্গীতে (যে যেভাবে পারেন—মার্কস হলে মার্কস, টাটা হলে টাটাকে উদ্ধৃত করে) চলছে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা এক মরিয়া প্রচেষ্টা। স্বাভাবিক! কারণ কৃষিভিত্তিক পশ্চিমবাংলার কৃষকদের যদি বোঝানো না যায়, যে 'তাদের উন্নয়নের স্বার্থেই আসলে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে'—এবং সমাজে মতামত গঠন করে যে অংশটা, সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশকে যদি এই উচ্ছেদ কর্মসূচীর স্বপক্ষে টেনে রাখা না যায়, প্রভাবিত করা না যায়, তাহলে গোটা কর্মসূচীটাই কেঁচে গণ্ডুষ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা! কাজেই উচ্ছেদ— তা যতই 'অমানবিক' হোক— কেন তা আজকের দিনে 'প্রয়োজনীয়', 'অবসম্ভাবী', অথবা 'অনস্বীকার্য'— তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তির হাত ধরে যুক্তি আসছে, তার হাত ধরে

আরেকটা যুক্তি...। তার মধ্যেই, যে সমস্ত যুক্তিগুলি সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে, আমরা আমাদের যাবতীয় অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা দিয়ে সেগুলোর-ই বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা চেষ্টা করছি। আসলে সমাজের ঐ দ্বিতীয় অংশটা, যারা সামাজিক মতামত গঠন করে, খুব ছোট হলেও আমরা তারই একটা অংশ। কাজেই আমাদের মতামতটাও আপনাদের কাছে, সমাজের কাছে যাওয়াটা প্রয়োজন। কম. কোঙার, ধৃষ্টতা মাফ করবেন।

যুক্তি-এক: পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা বিগত কয়েক বছরে নিম্নমুখী, যা থেকে কৃষকদের রক্ষা করা জন্যই প্রয়োজন 'শিল্পায়ন' তথা 'উন্নয়ন'-এর।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে: "নয়া উদার অর্থনীতির দেড় দশক পেরিয়ে আজ পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে। গ্রামীণ জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু জমি তো বাড়ছে না। প্রায় ৭৩ লক্ষ চাষের সাথে যুক্ত মানুষ আছেন, যাঁরা ক্ষেতমজুর। আর এদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য জমির পরিমাণও বেশি নেই। ৮০-র দশকে কর্মদিবস ও ক্ষেতমজুরের মজুরী বৃদ্ধি পেলেও ৯০-র দশক থেকে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে। '৯১-২০০১-এর মধ্যে ১২.৩% মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে অকৃষিকাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এমনকি ক্ষেতমজুরের একটা বড় অংশই বছরে ১৮০ দিন কাজ পান না। চাষের খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের আয় কমতে বাধ্য।...." (সূত্র: 'আল থেকে আলো'; এস এফ আই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটি, পৃ. ৮।)

আরও একটি গবেষণা এ প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখ করা হচ্ছে, যেখানে অঙ্ক কষে দেখানো আছে একটি তিন ফসলী জমিতে কৃষকের গড় মাসিক আয় মাত্র ১৪১৪ টাকা। (সূত্র: 'কৃষক দরদীদের কান্নার জবাবে'; অমল হালদার)।

উপরের দুটি উদ্ধৃতির-ই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল: কৃষকদের দুরবস্থা। আর তা থেকে তাদের মুক্তি দিতে, মাসিক আয় বৃদ্ধি করতে তথা কর্মসংস্থান বাড়াতেই প্রয়োজন বামফ্রন্ট আয়োজিত 'শিল্পায়ন'-এর।

এবার আমরা দেখি ঠিক ঐ একই তথ্য, সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে কেমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে ওনাদেরই লেখায়—যা পড়ে মনে হবে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকরা খারাপ-তো নয়ই, উল্টে দারুণ আছেন! সি পি আই (এম)-এ তাত্ত্বিক মুখপত্র পিপলস্ ডেমোক্রেসি-র একাদশ ভল্যুমের ৪১ নং সংখ্যায় (অক্টোবর, ২০০৬) কম. বিনয় কোঙার লিখছেন: "...Here, by the way of peasant's uprising, land reforms have been achieved as far as possible in a capitalist-landlord state. Feudal concentration of land is gone. Enthusiastic participation of peasants in

panchayets has resulted in the expansion of imigration and intensity of cropping. West Bengal is in the fore front so far as the rate of increase in agricultural production in concerned. Purchasing power in the rural areas has increased. Cormmunication has improved a lot, and trade and commerce and non-agricultural scetors have also developed. During the preriod 1991-2001, people engaged in non-agricultural works have increased by 12.3 per cent and in the same ratio, the number of those engaged in agriculture has decreased...'' [Article : *Left Front Govt. & Bengal's Industrialization*].

অর্থাৎ, কম. কোঙারের বক্তব্য অনুযায়ী, ভূমি সংস্কারের সুবাদে, জলসেচ ও চাষবাসের উন্নতির সুবাদে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সুবাদে-ই পশ্চিমবাংলার কৃষকদের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে শিল্পে (অকৃষি কার্যে) চলে যাচ্ছেন। আর এস. এফ. আই.-এর বক্তব্য অনুযায়ী, '৯০-এর দশক থেকে তৈরি হওয়া 'স্থিতাবস্থা'-র কারণেই কৃষকরা কৃষি ছেড়ে অকৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন! কোন্টা ঠিক? কম. কোঙা বলছেন, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। আর তাঁরই দলের ছাত্রসংগঠন বলছে, 'চাষের খরচ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের আয় কমতে বাধ্য।' কোন্টা ঠিক? কম. কোঙারের বক্তব্য অনুযায়ী বামফ্রন্ট জমানায় বাংলার কৃষকদের জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে; অথচ এস. এফ. আই-এর দলিল বলছে, পরিস্থিতিটা উল্টো! বাংলার কৃষকদের অবস্থা খুবই করুণ! কোন্টা ঠিক? আসলে, কোন্টা যে ঠিক, বাংলার কৃষকদের অবস্থাটাকে (বাস্তবে তা যা-ই হোক না কেন) ঠিক কিভাবে বর্ণনা করলে তাদের কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ করাটাকে জন-মানসে গ্রাহ্য করানো যায়, সিপিএম নেতৃত্ব এখনো সেটা ভালোমতো ঠাওর করে উঠতে পারেননি। যুক্তি জালে তাই বার বার ফেঁসে যাচ্ছেন নিজেরাই। এস. এফ. আই.-এর বক্তব্য ঠিক হলে, বলতে হয়, বাংলার কৃষকদের অবস্থা যেহেতু সঙ্গীন, কাজেই তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থেই কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা ন্যায়সঙ্গত। তাতে 'উচ্ছেদ'-এর প্রশ্নটার একভাবে মীমাংসা হয় বটে, কিন্তু বিনয় বাবুরা পড়ে যান ভয়ঙ্কর ফাঁপরে। সেক্ষেত্রে তাঁদের মেনে নিতে হচ্ছে, বামফ্রন্ট জমানায় কৃষকরা মোটেও ভালো নেই। এই স্বীকারোক্তি তাঁর পক্ষে করা অসম্ভব। পার্টি বকবে! তদুপরি, তিনি 'সারা ভারত কৃষক সভা'-র একজন সর্বভারতীয় কর্মকর্তা-ও বটে। আবার কম. কোঙারের বক্তব্য সঠিক হলে, অর্থাৎ বাম-জমানায় বাংলার কৃষকদের জীবন সত্যিই সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরে আছে এটা ধরে নিলে, স্বভাবতই যে প্রশ্নটা উঠবে—তাহলে আর কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ কেন? কৃষকরা যে অবস্থায় স্বচ্ছন্দ, সে অবস্থাতেই তাঁদের থাকতে দেওয়া হোক; শিল্প গড়ে উঠুক অকৃষি-জমিতে! কিন্তু এটা মেনে নেওয়া কোঙার বাবুদের পক্ষে আরও মুশকিলের, কারণ শিল্পপতিদের সাথে চুক্তি-টুক্তি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, বলটা গড়িয়ে গেছে অনেকদূর! আসলে 'সিদ্ধান্ত' যা নেওয়ার, তা তাঁরা আগেই নিয়ে ফেলেছেন; এখন চলছে সেই সিদ্ধান্ত-টার পিছনে লাগ-সই যুক্তি সাজানোর পালা। ফলে গুলিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক!

ওনারা ওনাদেরই দেওয়া পরস্পরবিরোধী যুক্তির জট খোলার চেষ্টা চালিয়ে যান; তাতে আপত্তি নেই। আমাদের শুধু দুটো কথা বলার প্রয়োজন : (১) 'acute unemployment' বা ভয়ঙ্কর বেকারিত্ব আর 'প্রসারিত বাজার' বা 'উচ্চ ক্রয়ক্ষমতা' একই সঙ্গে সত্যি হয় কি করে? (২) কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণেই যদি শিল্পায়ন হয়, তাহলে তো বলতে হয় এই বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার কৃষকরাই টাটা-র এক লাখী মোটরগাড়ীর ক্রেতা। সত্যিই কি তাই? নাকি ক্রেতা হলেন আই. টি. সেক্টরে যে মধ্যবিত্ত/উচ্চ মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছেন, তাঁরা? যদি তাই হয়, তাহলে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কারণে শিল্পায়নের যুক্তিটা তো দাঁড়ালো না কমরেড কোঙার!

আমাদের বক্তব্য

হ্যাঁ, এটা ঠিক, যে সারা ভারতের মতো, পশ্চিমবঙ্গেও কৃষকদের আয় নিম্নমুখী। ফসলের ন্যায্য মূল্য তাঁরা পাচ্ছেন না। উদার অর্থনীতি এবং কৃষিতে বহুজাতিক সার-বীজ কোম্পানিগুলির একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে কৃষকদের অবস্থা যে আগামী দিনে আরও অবনতির দিকে যাবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই ক্রমাবনতিকে কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? লড়াই-আন্দোলনের কথা না হয় তোলাই থাক। ভূমি সংস্কারের অপূর্ণ কাজটা কি সম্পন্ন করা যায় না? জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া যায় না কমরেড কোঙার? সিঙ্গুরে জমি নেওয়ার সময় যে মিথ্যেটা আপনারা সবেচেয়ে বেশি বলেছেন, তা হল ওখানকার অধিকাংশ জমি একফসলি। বলার সময় ভাবেননি, যে সে ক্ষেত্রে ওই জমি বছরের পর বছর একফসলি হয়ে পড়ে থাকার দায়-টাও আপনাদের ওপরেই বর্তায়! সিঙ্গুরে নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত বর্গাদারের যে হিসেব দিয়েছিলেন, মনে পড়ে সেটা? ২৩৭ জন নথিভুক্ত, ১৭০ জন অনথিভুক্ত। অর্থাৎ, অনুপাত প্রায় ৪:৩! এতো বেশি অনথিভুক্ত বর্গাদার কি ভূমিসংস্কারের দ্বিতীয় দফাকে সম্পন্ন করার কর্তব্য হাজির করে না?

বাংলার কৃষকদের উন্নতি সাধনের জন্য এতগুলো এবং আরও নানা ধরনের কাজ পড়ে আছে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই আরও ভাল বলতে পারবেন। সেগুলো সম্পন্ন করে তারপর যদি কৃষকদের উন্নতির জন্য মায়াকান্না কাঁদতেন, শিল্পায়নের কথা বলতেন, মানা যেত। কিন্তু সে'সব কিছু না করেই আপনারা টাটা-সালিমদের হয়ে সওয়াল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাই আপনাদের কৃষক দরদ নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে!

আমাদের মত, উপরোক্ত কাজগুলি করার পরও শুধু 'কৃষি' কখনোই একটি রাজ্যের সমস্ত মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই শিল্পের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু কোন্ ধরনের শিল্প? টাটা বা সালিম-রা কি সেই প্রয়োজন মেটাবে? সেই প্রশ্নে ঢোকার আগে আমরা আরও একটি কৃষি সম্পর্কিত বিষয়কে ছুঁয়ে যাব।

যুক্তি-দুই: 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'!

এটা সম্ভবত একুশ শতকের পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্যারাডক্স! এমন শ্রুতিমধুর অথচ মিথ্যে শ্লোগান পশ্চিমবঙ্গবাসী আগে কখনো শুনেছেন বলে মনে হয় না। এই শ্লোগানটি মনের মধ্যে যে ছবি এঁকে দেয়, তা আগের অংশে দেখানো বিনয়বাবুর বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এই শ্লোগানের মানে কী? মানে হল: কৃষিতে আমাদের সাফল্য এসে গেছে; তার ওপর ভিত্তি করে এবার আমাদের শিল্পায়ন করতে হবে। যেন এই শিল্পায়নের প্রক্রিয়াটা পুরোটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে হবে! এ-যেন সেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রমিক-কৃষকের যৌথ নেতৃত্বে বুর্জোয়া-বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচিকে সমাপ্ত করার প্রয়াস। যেন বঙ্গদেশে বিনয়বাবুদের নেতৃত্বে বিপ্লবের কাজ শেষ হয়েছে, আর বিপ্লব পরবর্তী ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার যে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, তাকে কাজে লাগানোর জন্যই শিল্প গড়ার প্রয়াস চলছে! অথবা, এ-যেন সেই ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের মডেল মোতাবেক কৃষির গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া ক্লাসিকাল পুঁজিবাদ! এদুটির কোনটিই যে আজকের পশ্চিমবাংলার বাস্তবতা নয়, তা বোঝার জন্য বিরাট মার্কসবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ এই মিথ্যে ছবিটিকেই মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের ভূতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন কমরেড কোঙার। যে কোনও বক্তব্যের সঙ্গে যদি মার্কসবাদী সাহিত্যের দু-চারটে কোটেশান জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটা বেশ ভারিক্কি হয়; না-ই বা থাকলো সেই কোটেশানের সঙ্গে বাস্তবের বা বক্তব্যের মিল। ব্যাপারটা বেশ 'রাজনৈতিক' করে তুলতে হবে কিনা! আসুন, দেখা যাক কমরেড বিনয় কোঙারের এরকমই 'রাজনীতি'র কিছু নমুনা।

'Left Front Govt. & Bengal's Industrialization' লেখায় (পিপল্‌স ডেমেক্রেসি, একাদশ ভল্যুম, ৪১নং, অক্টোবর ২০০৬) 'Misplaced opposition', 'Illusions about LF Govt.' এবং 'Reality of Marxism' অংশ তিনটি খেয়াল করুন। বিনয়বাবু, প্রথমে খানিকটা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন— যে, কেন ওঁদের অভিযুক্ত করা হচ্ছে ওঁরা পশ্চিমবঙ্গের মতো অঙ্গরাজ্যে 'সমাজতন্ত্র' কায়েম করছেন না বলে? আমরা একটু হেসে বলতে চাই— বিনয়বাবু, কেউ সেই প্রত্যাশা আজ আর করেন না সিপিএম-এর কাছ থেকে। কাজেই প্রত্যাশাই যদি না থাকে, অভিযোগই বা থাকবে কেন? এরপর উনি ভুরি ভুরি লেনিন তুলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মার্কসবাদীরাও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ নিজের হাতে করে; যেমন রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের পর সেখানে 'নেপ' (New Economic Policy) নিয়ে আসা হয়েছিল, পুঁজিপতিদের নানা রকম ছাড় দেওয়া হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও, এমনকী, পুঁজিবাদের বিকাশের পথ সুগম করতে হয়েছিল খোদ কম্যুনিস্টদের। চীনেও তাই। এর স্বপক্ষে লেনিন-এর সংগৃহীত রচনাবলীর ৩২ এবং ৩৩ নম্বর ভল্যুম থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন কমরেড কোঙার। যদিও নিজের কথা লিখেছেন খুব কম, কারণ খুব বেশি কিছু বলারও ছিল না। নিজের কথা হিসেবে যেটা তিনি বলতে চেয়েছেন, তা

হল— লেনিনরা বা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিপ্লবের পর দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেন, পুঁজিপতিদের নানা ছাড় দেন, তাহলে বুদ্ধবাবু টাটা বা সালিমকে ডেকে কী অন্যায় করলেন? সত্যিই তো, কী অন্যায় অভিযোগ! সিপিএম ছাড়া আর কেউ কি লেনিন পড়েন না?

আমাদের বক্তব্য

হেসে খুন হয়ে যাচ্ছি কমরেড কোঙার! নভেম্বর বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া বা নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তী চীন, আর আজকের পশ্চিমবঙ্গকে এক করে দিলেন? আপনি বোঝেন না, নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন? রাশিয়া বা চীনে বিপ্লব-পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রমিক-কৃষকের যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'রাষ্ট্র'-এর শ্রেণি চরিত্রটাই সেখানে বদলে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল অর্থনীতির দিশা। আর সে সব কিছুই কি এখানে, এই পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে? ভারতবর্ষে হয়েছে? কারা এখানে ক্ষমতায়? ভারতরাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্রটাই বা কী? সব ভুলে গেলেন? বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় যখন 'নেপ' আনা হচ্ছে, তখন পুরো দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কারা ছিল? সে দেশের মেহনতি মানুষেরা। এখানে কারা? অন্য সময়, যখন শিক্ষা-স্বাস্থ্যর মতো পাবলিক-ওয়েলফেয়ার সম্পর্কিত ইস্যুতে আপনারা অভিযুক্ত হন, তখন নিজেদের মুখরক্ষা করতে একথাটাই তো আপনারা বলেন— যে, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা হল বিকৃত পুঁজিবাদ, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ আর ঔপনিবেশিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন— তার একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে কিই বা আর করা যেতে পারে! কিন্তু এক্ষেত্রে তো তা বলছেন না? বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় 'নেপ' যখন নেওয়া হয়, তখন ক্ষমতার ভারসাম্য কার দিকে ঝুঁকে ছিল? শ্রমিক শ্রেণির দিকে। আজ আমাদের দেশে তা কোন্‌দিকে ঝুঁকে আছে? অবশ্যই টাটা-বিড়লা-গোয়েঙ্কা-আম্বানিদের মতো বড় বড় পুঁজির মালিকদের দিকে। আর তাদের পৃষ্ঠপোষণকারী বৈদেশিক শক্তিগুলির দিকে। আপনারাই যাদের অন্যসময় ডাকেন 'সাম্রাজ্যবাদী' নামে। এসব যুক্তি অন্য সময় আপনারাই দেন— আন্দোলন না করার অজুহাত হিসাবে— তাই চেনা চেনা লাগছে নিশ্চয়ই কথাগুলো! তাহলে পুঁজিবাদের যে বিকাশ এই টাটা বা সালিমদের হাত ধরে হবে, তাকে কি রাশিয়া বা চীনের বিপ্লব পরবর্তী পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে একাসনে বসানো যায়?

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এই দুটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণতই আলাদা। একটা বিপ্লবোত্তর সমাজে কৃষির গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদ, কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদ-এর একটা শিকড় থাকে সমাজের গভীরে। আর আজ সালিম বা টাটা-র মতো বড় বড় পুঁজির মালিকদের হাত ধরে পুঁজিবাদের যে বিকাশ, আজকের নব্য-উদার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তা এক ধরনের বিকৃত, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী বিকাশকেই সূচিত করবে। যার কোনো শিকড় সমাজের গভীরে তো থাকবেই না, বরং নিয়ন্ত্রণের সুতোটা থাকবে

বহুক্ষেত্রেই বিদেশি রাষ্ট্রগুলির হাতে। পুরো প্রক্রিয়াটাই এখানে প্রকৃত পুঁজিবাদী বিকাশের ঠিক বিপরীত। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ভূমি সংস্কারের শ্লোগান-এর জন্ম কম্যুনিস্টরা দেয়নি, দিয়েছিল বুর্জোয়ারা। ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতেই এই শ্লোগানকে তারা একটা সময় সামনে এনেছিল। কাজেই, ভূমি সংস্কারের কর্মসূচিটিকেই যদি বুর্জোয়া বিকাশের একটা মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহলে কী ঘটতে চলেছে? ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষকদের হাতে যে জমি এসেছিল, তা আবার তাদের কাছ থেকে কেড়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে টাটা-সালিমদের হাতে। পুঁজিবাদী বিকাশের এটা অগ্রগতি তো নয়ই, বরং পশ্চাদপসরণ! আগে ভূমিসংস্কারের সুফলের ওপর ভিত্তি করে গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছিল (যা গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে অতিরিক্ত মানুষের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান ঘটাতেও সাহায্য করেছে), তার অনেকগুলোকেই আজ স্রেফ তুলে দিতে হবে আপনাদের 'উন্নয়ন' কর্মসূচির ধাক্কায়। সিঙ্গুরের জমিতে আলু চাষ বন্ধ হয়ে গেলে সেখানকার হিমঘর শিল্পগুলির কী হবে? সোজা উত্তর— উঠে যাবে! কর্মসংস্থানের প্রশ্নে না ঢুকেও এটুকু অন্তত বলাই যায় যে এই শিল্পায়ন আর যাই হোক, কৃষির ওপর ভিত্তি করে নয়। এবং এর মাধ্যমে পুঁজিবাদের প্রকৃত বিকাশের আশা করাটাও অমূলক। কথা হচ্ছে, সরকার বা শাসক দল তথা বিনয়বাবুরা সে-সব জেনে বুঝেও লেনিনের ভূতকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে এইসব আজগুবি তত্ত্ব আমদানি করছেন। পুরো ব্যাপারটাকে 'কৃষি থেকে শিল্প'— এরকম একটা এক-রৈখিক যাত্রা হিসাবে দেখানোর মাধ্যমে জনগণকে নির্ভেজাল ধোঁকা দিচ্ছেন।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে! বিনয়বাবুদের লেনিন পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদেরই ভাবশিষ্যদের কেউ কেউ বলছেন, বিপ্লবপরবর্তী রাশিয়াতেও তো জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল কৃষকদের কাছ থেকে। কৃষকরা তখনও বাধা দিয়েছিলেন। তার মানে, কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিতে গেলেই তাঁরা বাধা দেবেন। কেউ কেউ আবার আগ বাড়িয়ে মার্কস-এঙ্গেলস থেকে উদ্ধৃত করে বলছেন, জোতদার-জমিদারদের থেকে জমি দখল করা সময় (অর্থাৎ, কৃষকরা যখন জমির 'মালিক' ছিল না) কৃষকদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল; কিন্তু একবার জমি পেয়ে গেলে তার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রগতি বিরোধী— কারণ সামাজিকীকরণের জন্য জমি ছাড়তে তখন সে মোটেই রাজি হয় না। অতএব কৃষকদের এই 'জমি দিতে না চাওয়ার' প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাটি থাকবেই, এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই আজকের কম্যুনিস্ট কর্তব্য!

দারুণ! বিপ্লবের পর সামাজিকীকরণের জন্য রাশিয়ায় কৃষকদের কাছ থেকে জমি নেওয়া, নিয়ে রাষ্ট্রের মালিকানা স্থাপন করা, আর সিঙ্গুরের চাষিদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে তাতে টাটাদের মালিকানা স্থাপন করাটা এক হয়ে গেল? এই যদি আপনাদের 'কম্যুনিস্ট কর্তব্য'-র নমুনা হয়, তবে বলতেই হবে, বুদ্ধবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রতন টাটা-ও মার্কসবাদে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিচ্ছেন! আপনারা আপনাদের কম্যুনিস্ট কর্তব্য নিয়ে থাকুন। আর দেখুন, তার পরিণতিতে সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম হয়ে আর কী কী ঘটে!

যুক্তি-তিন: এই শিল্পায়নে কর্মসংস্থান বাড়বে, বেকারত্ব কমবে

এই যুক্তিটি অনেকটাই প্রথম যুক্তির পরিপূরক। মোদ্দা কথা যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা হল: পশ্চিমবঙ্গ একটি কৃষি প্রধান রাজ্য; অথচ ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষকের যা উন্নতি হওয়ার ছিল, সেটা সম্পৃক্ত হওয়ার পথে। এর মধ্যেই কৃষি থেকে কৃষকদের লাভ পড়তির দিকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে আর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হচ্ছে না। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। সে-জন্যই চাই শিল্পায়ন। সিঙ্গুর-এ টাটার মোটরগাড়ি কারখানা এবং তৎসহ অনুসঙ্গী শিল্প, সালিমদের মোটরবাইক কারখানা, কেমিক্যাল হাব, নন্দীগ্রাম-এর SEZ-এ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ওই কর্মসংস্থান জনিত সমস্যার সুরাহা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গেই আসছে শ্রমদিবসের কথা। অর্থাৎ কৃষি যা শ্রমদিবস তৈরি করতে পারে, এই ধরনের বৃহৎ শিল্প তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রমদিবস তৈরি করবে। এসবই এই ধরনের শিল্পায়নের পক্ষে একটি অন্যতম যুক্তি— যা শাসকদলের পক্ষ থেকে পেশ করা হচ্ছে।

আমাদের বক্তব্য

প্রকৃতপক্ষে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই ধরনের শিল্প কতটা কার্যকর— তা নিয়ে একটি পৃথক লেখায় আলোচনা করা উচিত। আমরা এখানে কয়েকটি বিষয়কে শুধুমাত্র উল্লেখ করতে চাইছি— যা শাসকদলের আপাত-সরল প্রকল্পটিকে কিছুটা প্রশ্নের সম্মুখীন করবে।

(ক) পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পগুলি আসছে, সেগুলি পুঁজিনিবিড়, উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প। সরাসরি এই ধরনের শিল্পে কর্মসংস্থান হয় কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার/প্রোফেসনাল-দের। তাও খুবই স্বল্প সংখ্যায়। সেই রকম শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও আমাদের রাজ্যে আছেন। তাই তাদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই ধরনের শিল্প যে একটা ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে সংশয় থাকার কথা নয়। যদিও এটা মাথা রাখতে হবে যে সেই সংখ্যাটি মোটের ওপর খুবই কম। কারণ এই ধরনের শিল্পে সাধারণত প্রতি এক থেকে পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ পিছু একটি চাকরি সৃষ্টি হয়। এতোটাই পুঁজিনিবিড় শিল্প এগুলি। তাই, যদি সিঙ্গুরে টাটার কারখানা নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে বলতে হয়, টাটার কারখানায় যাঁরা সরাসরি চাকরি পাবেন তাঁর প্রায় কেউই সিঙ্গুরের জমিচ্যুত মানুষ হবেন না, কারণ ওই কারখানায় কাজ করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই থাকবে না। খুব সামান্য কিছু শিক্ষিত ছেলেমেয়েকে হয়তো ITI বা কাজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টাটারা নিতে পারে। যেমন সম্প্রতি ২৫ জন ছাত্রের জন্য একটি পরীক্ষা তাঁরা নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে মাত্র ১১ জনকে তাঁরা বেছেছেন, যাঁরা সরাসরি গাড়ী কারখানায় কাজ পাবেন। ভাবুন, মাত্র ১১ জন! এবং তাতেও এতো ঝাড়াই বাছাই পর্ব থাকছে সেখানে! খুব স্বাভাবিক। এবং এই সত্যটাকেই কোথাও স্বীকার করা যাচ্ছে না যে, সিঙ্গুরের জমিচ্যুতদের ভবিষ্যৎ টাটার কারখানায়

কর্মসংস্থান নয়। টাটারা খুব বেশি হলে ১০০০-১২০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবেন, তাও সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সারা ভারতবর্ষ থেকে— শুধু সিঙ্গুর থেকে নয়।

(খ) যখন উপরোক্ত বক্তব্যটি বলা যাচ্ছে, তখন এর সঙ্গে শাসক দল বলছেন, সিঙ্গুরে শুধু টাটারা আসছেন তাই নয়, তারই সঙ্গে প্রায় চল্লিশটি অনুসারী শিল্প ওই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা হবে। এবং ওই অনুসারী শিল্পগুলিতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। আবার একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বিশেষণ: 'প্রচুর'! 'প্রচুর' মানে কত? কেউ বলছেন ১০,০০০, কেউ ২০,০০০, কেউ ৩০,০০০। আসলে হিসাবটা কেউই জানেন না। জানা সম্ভবও নয়। অথচ 'উন্নয়ন' হচ্ছে— এটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আবার একটি কাল্পনিক হিসাবকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ 'আপন মনের মাধুরি' মিশিয়ে! অথচ 'উন্নয়ন'-এর এই ধাক্কায় কতজন জীবিকাচ্যুত হচ্ছেন, সেটা কিন্তু স্পষ্ট। শুধু সরকারি হিসেবে ১২,০০০০ জন ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। যদি ধরাও যায় তার মধ্যে ২,০০০ জনের অন্য পেশা আছে, তাহলেও সংখ্যাটা দাঁড়ালো ১০,০০০। এবার এই সংখ্যার মধ্যে অনথিভুক্ত বর্গাদার ধরা আছে মাত্র ১৭০ জন। আর ক্ষেতমজুরদের কথা তো ধরাই নেই! যাঁরা সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমীক্ষা করছেন, তাঁদের মতে, হিসেবের বাইরে থাকা এই অনথিভুক্ত বর্গাদার এবং ক্ষেতমজুর মিলিয়ে মোট জীবিকাচ্যুতের সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। যদি ধরে নিই এই ২০,০০০ মানুষ টাটার কারখানার অনুসারী শিল্পে চাকরি পাবেন, তাহলে ৪০টি অনুসারী শিল্প কারখানার প্রতিটিতে গড়ে কতগুলি মানুষ কাজ পাবেন? $\frac{২০০০০}{৪০}$ = ৫০০ জন! হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে নাকি ৬০০-র উপরে অনুসারী কারখানা গড়ে উঠেছে। গড়ে কতজন করে শ্রমিক আছেন ওই শিল্পগুলিতে? পৃথিবীর কোন্ মোটর গাড়ি কারখানার অনুসারী শিল্পে ৪০টি কারখানায় গড়ে ৫০০ জন করে শ্রমিক নিযুক্ত আছেন? আমাদের তথ্য দিয়ে বোঝান। যদি পৃথিবীর কোনো একটি স্থানের পরিসংখ্যান দিয়েও প্রমাণ করতে পারেন যে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পুঁজিনিবিড় অটোমোবাইল শিল্প এবং তার অনুসারী শিল্পগুলি মিলিয়ে ২০,০০০-এর বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই টাটাকে স্বাগত জানানোর কথা ভাবতে পারি।

কিন্তু সেটা আপনারা করবেন না। করা সম্ভবও নয়। কারণ যা বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়, তাকে আপনারা দেখাবেন কী করে? আপনারা যা পারবেন তা হল ভাসা ভাসা কিছু কথা বলে, আর একটা গ্ল্যামারাস উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বহিরঙ্গের চটক দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। আর সেটাই আপনারা করছেন। তাই যেখানে মানুষ জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আক্ষরিক অর্থে 'সর্বহারা' সেই মানুষ, তারা সবাই আপনাদের দেখানো 'সোনালি' স্বপ্নে গা ভাসাতে অস্বীকার করছে।

(গ) 'শ্রমদিবস'-এর মাধ্যমে এই ধরনের শিল্পের গুনগান গাওয়াটা অনেকটা 'অশ্বত্থামা হতঃ, ইতি গজ'-এর মতো ব্যাপার। এটা সকলেই বোঝেন যে কারখানায় যে শ্রমদিবস তৈরি হয়, তা কৃষির তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু যেটা বুদ্ধবাবু বা বিনয় কোঙাররা বলছেন না, তা হল— কৃষিতে যে শ্রমদিবস তৈরি হয়, তা বহু মানুষের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, কিন্তু কারখানায় তৈরি হওয়া শ্রমদিবস সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি হলেও

শেষতঃ তা ভাগ হয় খুব সামান্য সংখ্যক মানুষের মধ্যেই। উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তা আরও কম। এই বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক কল্যাণ সান্যাল আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৭ ডিসেম্বর একটি প্রবন্ধে খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন। যেখান থেকে এটা সহজেই বোঝা যায়, বর্তমান যুগের উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প প্রসূত বাড়তি শ্রমদিবস-এর সুফল সীমাবদ্ধ থাকে খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে। আর সেই শিল্প যদি কৃষিকে উচ্ছেদ করে তৈরি হয়, তা হলে শ্রমিক সংখ্যার দিক থেকে তা কখনোই কৃষির বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। কারণ শ্রমদিবস মানেই শ্রমিক নয়। তাই কৃষিকে উচ্ছেদ করে যদি এই ধরনের শিল্প তৈরি হয়, তবে তা সুফল দেওয়ার পরিবর্তে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধিতেই ভূমিকা নেবে। একদিকে মুষ্টিমেয় 'হোয়াইট কলার' উচ্চ বেতনভুক কর্মী আর অন্যদিকে খুব সামান্য বেতনের, অনিশ্চিত ঠিকা প্রথায় নিযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক— এটাই এই ধরনের শিল্পের এখনও অবধি বিশ্বব্যাপী রূপ। আর বুদ্ধবাবু, বিনয় কোঙাররা জেনেশুনেও তাকে মহিমান্বিত করে চলেছেন।

যুক্তি চার: পুঁজিপতিদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা না দিলে তাঁরা অন্য রাজ্যে চলে যাবেন, কর্মসংস্থানে/উন্নয়নে পিছিয়ে পড়বে এই রাজ্য।

এতক্ষন অবধি শাসকদলের দেওয়া তিনটে যুক্তিকে খেয়াল করুন। তাঁরা বোঝাতে চাইছিলেন যা তাঁরা করছেন, সেটা উন্নয়নের জন্য বা রাজ্যের মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বলেই করছেন। অর্থাৎ তাঁদের যুক্তির মধ্যে একটা বিশ্বাসবোধ যেন কাজ করছিল যে যা তাঁরা করছেন— ভেবেচিন্তেই করছেন এবং ঠিক করছেন। উন্নয়নের গতিমুখ এমনটাই যেন হওয়া উচিত। বাধ্যতার কোন প্রসঙ্গ সেখানে ছিল না। কিন্তু বিরোধী বক্তব্যগুলি যখন আসতে থাকে, তখন তাঁদের যুক্তির ধরনও পাল্টাতে থাকে। যেমন এই চতুর্থ যুক্তিটি। এখানে বলা হচ্ছে যে— এখন পুঁজি বিনিয়োগ টানার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলছে। সব রাজ্যই পুঁজিপতিদের কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজের রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছেন। এটাকেই অর্থনীতিবিদ্ প্রভাত পট্টানায়েক বলেছেন 'Social Bribe' বা 'সামাজিক ঘুষ'। এখন এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যদি কোনও রাজ্য সরকার বলে— 'আমি ওইরকম বাড়তি সুবিধা দেব না', তাহলে বিনিয়োগ টানায় সে পিছিয়ে পড়বে। এবং যেহেতু শাসক দলের যুক্তি কাঠামো অনুযায়ী বিনিয়োগ = কর্মসংস্থান = উন্নয়ন, অতএব সে রাজ্যের উন্নয়নও স্তব্ধ হবে যাবে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে বিনিয়োগ টানার প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে এবং পুঁজিপতিদের কিছু বাড়তি সুবিধা দিতেই হবে।

অতএব এতক্ষনে বাধ্যতার কথা এল। কেন এল? কারণ কোনো যুক্তি দিয়েই 'সিঙ্গুরের জমিই কেন টাটাদের দেওয়া হবে?'— এর সন্তোষজনক কোনও উত্তর দেওয়া যাচ্ছিল না। অতএব এসে পড়ল বাড়তি সুবিধাদানের বাধ্যতার প্রসঙ্গ। সিঙ্গুরের জমিই কেন দিতে হল?— না, টাটারা ওই জমিটাই চাইলেন বলে! আমরা না দিতে চাইলে

অন্য রাজ্যে চলে যেতেন। কিন্তু এতক্ষন যে লেনিন-মার্কস থেকে কোটেশন দিয়ে বলছিলেন কৃষকদের কৃষি থেকে শিল্পশ্রমিকে পরিণত করাটাই আজকের কর্তব্য? তাহলে সেই যুক্তি অনুসারে তো সিঙ্গুরের জমি নিয়ে আপনারা ঠিক কাজই করেছেন। এখন আবার একটু 'বাধ্য হয়ে খারাপ কাজ করতে হল'— ধরনের সাফাই গাইছেন কেন? নিজেরাই তো নিজেদের আগের যুক্তির ধরন থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের যুক্তিতে পিছলে গেলেন!

অবশ্যই তার কারণ আছে। কারণটি হল— এই বাধ্যতার যুক্তিকাঠামোটি আপনাদের কমিউনিস্টের মুখোশ পরে সমস্ত পুঁজিবাদী কর্মকাণ্ড করে চলার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। আপনাদের যুক্তি-কাঠামোটিই এইরকম: সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল। শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে। ভারতবর্ষেও মানুষ মোটেই বিপ্লব করতে আগ্রহী নয়। অধিকাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত নয়। যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বামদের সঙ্গে নেই। কেন্দ্রর ক্ষমতাতেও বামপন্থীরা নেই, যে তাঁরা দেশ জুড়ে একটা অন্যরকম অর্থনীতি প্রণয়নের চেষ্টা করবেন। শুধুমাত্র একটি দুটি রাজ্যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় রয়েছেন। ভারত জুড়ে যখন নব্য উদার (নিও লিবারাল) অর্থনৈতিক নীতির রমরমা, তখন সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্য সরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সেই নীতির অনুসারী হতে বাধ্য। এই একই বাধ্যতার বশবর্তী হয়ে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বন্ধ করতে হবে এবং আরও বহু কিছু করতে হবে— যা শ্রমিক-কৃষক বিরোধী।

কী মুশকিল বলুন তো! একদিকে সরকারকে থাকতে হবে, (কারণ আমাদের মতে বামপন্থী সরকার অন্যান্য সরকারের তুলনায় বেশি 'রিলিফ' দিতে পারবে। আর এর মধ্যে দিয়েই মানুষের বামপন্থার প্রতি আস্থা তৈরি হবে) অথচ অন্যদিকে সরকারে থাকতে গিয়ে, পুঁজিপতিদের শর্ত মেনে তাঁদের খুশি করে চলতে হবে। চলতে গিয়ে বহু জায়গায় 'রিলিফ' দেওয়া তো দূরে থাক, উল্টে মানুষের জমি-জীবিকা ধরে টানাটানি করতে হবে। এই স্ববিরোধের সমাধান কী? আপনাদের উদ্ভাবনী মস্তিষ্কে একটি সমাধান এল। আপনারা লাইন নিলেন, কেন্দ্রে এবং যেসব রাজ্যে দক্ষিণপন্থী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, সেসব জায়গায় আপনারা যথাসম্ভব জঙ্গি হবেন, সেখানে আপনারা 'বাম' ভাবমূর্তি যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপোষ না করার কথা বলবেন। আর অন্যদিকে, যেখানে ক্ষমতায় থাকবেন, সেখানে 'বামপন্থী সরকার টিকিয়ে রাখার ঐতিহাসিক দায়িত্ব' পালন করতে গিয়ে জঙ্গিয়ানা ত্যাগ করার উপদেশ দেবেন, কারখানায় কারখানায় মালিক-এর সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলবেন, কথায় কথায় শিল্পপতিদের গুণকীর্তন করবেন এমনভাবে, যেন তাঁরা সমাজসেবা করার জন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চাইছেন, মুনাফা করার জন্য নয়!

কী আশ্চর্য— তাই না! 'রিলিফ' দেওয়ার জন্যই সরকারে থাকা, অথচ সরকারে থেকে কাজ হল কৃষককে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করা। আপনারা বোধহয় কৃষককে জমির দায় থেকেই 'রিলিফ' দেওয়ার কথা বলতে চেয়েছেন! সত্যি,

এই বাম সরকারের কার্যকলাপ তো ক্রমশ 'কমিক রিলিফ' হয়ে যাচ্ছে কোঙার সাহেব!

আমাদের বক্তব্য

এই যুক্তিকাঠামো এবং তার রাজনীতিকে আমরা যে প্রশ্নগুলো করতে চাই তা হল—

(ক) যে বাধ্যতা থেকেই হোক না কেন, এরাজ্যের বামপন্থী সরকারও বিনিয়োগ টানার জন্য অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 'অসুস্থ' কেন? না, এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল পুঁজিপতিদের আরও সুবিধা (সামাজিক ঘুষ) দিয়ে নিজের রাজ্যে বিনিয়োগ করানো। আর একথা সমস্ত বামপন্থীই বোঝেন যে, পুঁজিপতির স্বার্থ এবং খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ সর্বদা পরস্পরবিরোধী। তাই পুঁজিপতিকে তখনই বাড়তি সুবিধা অর্থাৎ মুনাফা বাড়ানোর সুবিধা দেওয়া যায়, যখন মেহনতী মানুষের কিছু না কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়। যেমন সিঙ্গুরে টাটাদের পছন্দের জমি দিতে গিয়ে এতোগুলো মানুষকে জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করতে হল। প্রশ্ন হল, এটা কি বামপন্থীদের কাজ? পুঁজিপতি কীভাবে তার মুনাফাকে বাড়াবেন, সেটা কি বামপন্থীরা ভাববেন?

(খ) এই 'বাড়তি সুবিধা' দানের শেষ কোথায়? আপনি একটা সুবিধা দিলেন, একটা দক্ষিণপন্থী রাজ্য সরকার মানুষকে আরও দুর্দশার মুখে ফেলে তার তিনগুণ সুবিধা দিল কোনও পুঁজিপতিকে। তখন আপনাকে চারগুণ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। মানুষের আরও কিছু সর্বনাশ করতে হবে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? মানুষকে 'রিলিফ' দেওয়ার আপনাদের যে ঘোষিত উদ্দেশ্য, এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা কি তার পরিপন্থী হয়ে যাচ্ছে না?

(গ) আপনারা বলছেন, বিশ্বপুঁজির সঙ্গে দরকষাকষি (bargaining) করাটা আজকের পর্যায়ে বামপন্থীদের কাজ। এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আপনারা এই দরকষাকষি একটা মাত্রায় করছেনও। কিন্তু দরকষাকষি করতে হলে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় রাখতে হয়। আজ যখন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম পুঁজি বিনিয়োগের জন্য যে-কোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত— এ ধরনের একটা ভঙ্গিমা নিয়ে পুঁজিপতিদের কাছে হাজির হচ্ছে, টাটা বা সালিমকে তাঁদের পছন্দমতো জমি দিতে গিয়ে মানুষের উপর পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে— এই মরিয়া ভাব কি দরকষাকষি করার মতো দৃঢ় অবস্থানে আপনাদের রাখতে পারছে? লড়ার আগেই তো হেরে বসে আছেন আপনারা, কমরেড কোঙার!

আসলে 'বাধ্যতা' থেকে যে রাজনীতির শুরু হয়, সেই রাজনীতি নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ব্যতিরেকে আর অন্য কিছুই দিতে পারে না। তাই টাটারা রাজ্য থেকে চলে গেলে কী হবে— এই আতঙ্ক আপনাদের সমস্ত মার্কসীয় তত্ত্ব ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় এই প্রাথমিক কথাটুকুও যে 'পুঁজিপতিরা যা চাইবেন তাই তাদের দিতে হবে'— এটা কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই একটা মার্কসবাদী দলের পরিচালিত সরকারের কর্মসূচি হতে পারে না!

যুক্তি পাঁচঃ আমরা বামপন্থী, তাই আমরা কৃষকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি; এর মাধ্যমেই মানুষ বামপন্থীদের আলাদা করে চিনে নেবেন

এই যুক্তিটি দুলাইনেই প্রকাশ করা গেছে। একে আর বিস্তৃত করার দরকার নেই। বরং সরাসরি আমাদের বক্তব্যে ঢুকে পড়া যাক।

(ক) তাহলে কমরেড, শেযে ক্ষতিপূরণ বেশি দেওয়াটাই একটা কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হয়ে দাঁড়াল? তা বেশ! আচ্ছা একটা কথা বলুন, শুধু এইটুকুর জন্য 'বিপ্লবী', 'মার্কসবাদী', 'কমিউনিস্ট'— এতো ভারি ভারি শব্দে ভূষিত হওয়ার কী দরকার ছিল? এতো একটা উদারপন্থী বুর্জোয়া সরকারও করতে পারে। অথবা সংস্কারপন্থীরা, কিংবা সংশোধনবাদীরা। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) হওয়া কী একান্তই জরুরি ছিল, সামান্য কিছু বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য?

(খ) ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে এতো বড়াই যখন করেন, তখন এই কথাটা তো একবারও বলেন না যে ক্ষতিপূরণ আসলে দেওয়া হয় জনগণের টাকা থেকেই। যে-লোকটি উচ্ছেদ হচ্ছে, তারও ট্যাক্সের টাকা তার মধ্যে আছে। আর সরকারের কোষাগার যেহেতু সীমিত, তাই ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৪০ কোটি টাকা দেওয়া হল মানে কার্যকর অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক খাত থেকে ১৪০ কোটি টাকা ঘাটতি হল। এর মধ্যে আপনাদের কৃতিত্বটা কোথায়? যদি টাটার কাছ থেকে ওই টাকা আদায় করতে পারতেন, তাহলেও নয় বোঝা যেত যে কিছু একটা করলেন। কিন্তু সেও তো trade secret বলে চেপে রেখেছেন! টাটারা কত দামে জমিটা পেলেন সেটা জানলে বোঝা যেত কেমন 'দরকষাকষি' করেছেন আমাদের 'বামপন্থী' বন্ধুরা।

(গ) আর ক্ষতিপূরণ আপনারা কেমন 'বেশি' দিচ্ছেন এ-নিয়ে অন্যত্র বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেতমজুররা কোনো ক্ষতিপূরণই পাননি (তাঁদের বোধহয় 'ক্ষতি' হয়নি, তাই না?)। বর্গাদাররা যা পেয়েছেন সে আলোচনা আর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। জমির মালিকরাও বাজারদের চেয়ে কম পেয়েছেন। এসবই অন্যত্র আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আপনাদের সবচেয়ে বড় ভণ্ডামি হল বামপন্থী হয়েও আপনারা নীতি নিয়েছেন ক্ষতিপূরণ ততোটাই দেবেন, যতটা ক্ষতিগ্রস্তরা সংগঠিতভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করবে। তাই যে-কোনো বিরোধী আন্দোলন তীব্র হলেই আপনারা ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেগোসিয়েশনের আহ্বান রাখছেন। তার মানে তো এটাই দাঁড়ায় যে, এটা আপনাদের হিসেবের মধ্যেই আছে, প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়াতে হতে পারে। তাই শুরুতেই সবটা দিয়ে দেবেন না। ক্ষতিগ্রস্তরা বা বিরোধীরা লড়ে নিক। দারুণ 'বামপন্থী' ভূমিকা! শ্রমিক-কৃষকের পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার পুঁজিপতির সঙ্গে দরকষাকষির কথা ভুলে গিয়ে এখন শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দরকষাকষি করছেন। চমৎকার!

যুক্তি ছয়ঃ বিপ্লবের সময় নয়। এখন বিশ্বপুঁজির সঙ্গে দরকষাকষির সময়

এই বক্তব্যটাকে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব শুধু রাজ্যে নয়, কেন্দ্রীয়ভাবে দেশজুড়ে আজকের পর্যায়ের কমিউনিস্ট কর্তব্য হিসাবে হাজির করেছেন। 'এখন বিপ্লবের সময় নয়'— এই কথাটা পুরনো। পার্টির প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই শোনা। কিন্তু 'বিশ্বপুঁজির সঙ্গে দরকষাকষি'র ব্যাপারটা নতুন। একটু ভেঙে বললে বক্তব্যটা এরকম— বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার ভারসাম্য যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে আছে এবং এদেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, অতএব বিশ্বপুঁজিকে পুরোপুরি আটকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তার সঙ্গে দরকষাকষি করা যাবে [আল থেকে আলো, পৃ. ৩-৪ দ্রষ্টব্য]। আর সেই দরকষাকষির অংশ হিসেবেই বিদেশী পুঁজির উপর তিনটি শর্ত তাঁরা আরোপ করার দাবি করছেন। প্রথমত, বিদেশি বিনিয়োগকে উৎপাদনমুখী হতে হবে। Finance Capital বা portfolio investment-কে যে কারণে উৎসাহ দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, বিদেশি বিনিয়োগকে অবশ্যই কর্মসংস্থানমুখী করতে হবে। তৃতীয়ত, বিদেশি বিনিয়োগকে আমাদের দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং উন্নত প্রযুক্তির আমদানি করতে হবে। [সূত্রঃ আল থেকে আলো, পৃ. ৫-৬], বিষয়টাকে আমরা এভাবেই বুঝেছি, ভুল হয়ে থাকলে SFI নেতৃত্বে শুধরে দেবেন আশা করি। এগুলিই দরকষাকষি এবং আজকে কেন্দ্রীয়ভাবে ভারতবর্ষ জুড়ে এবং রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই দরকষাকষিই বামপন্থীরা করছেন। ওঁদের মতে টাটা এই তিনটি শর্ত পূরণ করছে। অতএব, টাটার বিনিয়োগে আপত্তি থাকার কথা নয়।

আমাদের বক্তব্য

সিপিআই(এম)-এর কোনো প্রচার পুস্তিকা থেকে উপরোক্ত 'লাইন'টি পাওয়া গেলে ভাল লাগত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে এসএফআই-এর প্রচার পুস্তিকা থেকে। ছাত্র-কমরেডরা বোধহয় আজকাল বিনয় কোঙারদের চেয়ে স্বচ্ছভাবে পার্টি লাইনকে বুঝছেন। কারণ এখনও অব্দি পিপলস ডেমোক্রেসিতে বিনয় কোঙাররা যে উদ্ভট তত্ত্বায়ন-এর নমুনা আমাদের দেখিয়েছেন, তার তুলনায় উপরের বক্তব্যটি অনেক স্পষ্ট এবং অন্তত একটা নির্দিষ্ট অবস্থানকে বুঝিয়েছে। অযথা মার্ক্স-লেনিন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়নি। যাই হোক, উপরের অবস্থানটি কোনো একটি বামপন্থী দলের অবস্থান হতে পারে, তর্কের খাতিরে এটা ধরে নিলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়—

(ক) উপরের তিনটি শর্তের দ্বিতীয় শর্তটিতে যেখানে বলা হয়েছে বিনিয়োগকারী পুঁজিকে কর্মসংস্থান করতে হবে। তখন নিশ্চয়ই কর্মচ্যুতিকে ছাপিয়ে যে নেট কর্মসংস্থান হবে, তার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন বিনিয়োগ ২০,০০০ মানুষকে কর্মচ্যুত করার বিনিময়ে ২,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান করে, তাহলেও কি সেই বিনিয়োগকে

আমরা দুহাত তুলে স্বাগত জানাবো? একটু আগেই দেখানো হয়েছে, টাটাদের বিনিয়োগ কিন্তু তেমনই একটা বিনিয়োগ।

(খ) প্রথম শর্ত, অর্থাৎ উৎপাদনশীল পুঁজিকেই কেবলমাত্র স্বাগত জানানো হবে। তাহলে প্রশ্ন হল: রিয়েল এস্টেটে কোন ধরনের উৎপাদন হয়? সালিমকে তো রিয়েল এস্টেট করার জন্য এরমধ্যেই বহু জমি দেওয়া হয়েছে। এরপরেও শোনা যাচ্ছে নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব তৈরির জন্য জমি দেওয়া হবে তাদের। সেই 'কেমিক্যাল হাব'টা কী বস্তু? সেখানে কী উৎপাদন হবে, আর কত কর্মসংস্থান হবে যদি দয়া করে বলতেন? (অবশ্য, টাটাদের কারখানার মতো বাড়িয়ে হিসেব দিতেই পারেন, সে ব্যাপারে আপনারা অভিজ্ঞ)। আর ওই 'স্বাস্থ্য নগরী'! সেখানে কী 'স্বাস্থ্য' উৎপাদন হবে? আমরা আসলে এসব ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ, সবকিছুর সঙ্গে একটা করে 'নগরী' বা 'উপনগরী' লাগিয়ে দিলেই আমরা বড্ড confused হয়ে যাই! উৎপাদন আর কর্মসংস্থানের মহিমাটা ঠিক বুঝতে পারি না।

(গ) 'দরকষাকষি' যদি কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত লাইন হয়, তাহলে সেই দরকষাকষি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। টাটাদের সঙ্গে যখন চুক্তি হয়েছে, তখনও নিশ্চয়ই দরকষাকষির অবকাশ ছিল। টাটারা এসে বললেন, আমাদের সিঙ্গুরের জমিই চাই। আপনারা দিয়ে দিলেন। টাটারা বললেন, সঙ্গে ভর্তুকি হিসেবে রাজারহাটে রিয়েল এস্টেট করার জন্য জমি দিতে হবে। আপনারা দিয়ে দিলেন। টাটারা বললেন, জল এবং বিদ্যুতে ছাড় চাই। আপনারা দিয়ে দিলেন। 'দর কষাকষি'-টা করলেন কোথায় কমরেড? আর যদি করেই থাকেন তবে তা জানাতে এত সঙ্কোচ কেন? বীরের মতো 'কমিউনিস্ট কর্তব্য' কীরকম পালন করছেন সেটা আমরাও একটু জানি, বাহবা দেওয়ার সুযোগটা আমাদের অন্তত দিন!

উপরের তিনটি প্রশ্ন ছাড়াও 'দরকষাকষি' সম্পর্কে কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য রয়েছে আমাদের—

প্রথমত, আপনরাই একসময় শিখিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি কাজ হল শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার করা। কিন্তু ভারতবর্ষীর মার্কসবাদের অনুশীলনে আমরা দেখছি কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইএম-এর কথা বলা হচ্ছে এখানে) যেহেতু মনে করছে এখন বিপ্লবের সময় নয়, অতএব সে সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের একটি লক্ষণরেখা রচনা করছে এবং সেই গণ্ডির মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে, 'বিপ্লবী চেতনা-সঞ্চার' করা তো অনেক দূরের প্রশ্ন। যে রাজ্যে বাম সরকার আছে, সেখানে এই প্রবণতা আরও মারাত্মক। সেখানে সরকার টিকিয়ে রাখার এবং বিনিয়োগ আনার কর্মসূচির ফলে শ্রমিককে প্রায় হাত-পা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে আন্দোলন না করার জন্য। আর পুঁজিপতির সঙ্গে যাবতীয় নেগোসিয়েশন করছে পার্টি নিজেই। অথচ বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমন আরও তীব্র হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। সেটা দেশ বা রাজ্য সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই তীব্র আক্রমণের মুখে শ্রমিক আন্দোলনকে আরও সুসংহত রূপ দেওয়া, তাকে তীব্র করার পরিবর্তে সিপিআই(এম)

শ্রমিকদের আরও অসহায় আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফল কী হচ্ছে? শ্রমিকদের লড়াই না করার প্রবণতাকে অজুহাত করে যে পার্টি 'বিপ্লবী কর্মসূচি'কে দূরে সরিয়ে রেখে 'দরকষাকষি'র লাইন নিল, আজ আবার সেই লাইনই শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইকে তীব্র করার বদলে তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নতুন আক্রমণের সামনে, সেই ট্রেড ইউনিয়ন লড়াইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে কী দরকষাকষি হতে পারত, তার জন্য অপেক্ষা না করেই, পার্টি তার হয়ে আগেই নিজের বোঝাপড়া অনুযায়ী দরকষাকষি করে শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে দূরে রাখার কর্মসূচি নিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, একটি কমিউনিস্ট পার্টি যখন দরকষাকষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন অবশ্যই ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত পার্টির সামগ্রিক বিপ্লবী কর্মসূচির সঙ্গে আজকের দরকষাকষির ভূমিকার সম্পর্ক কি। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই একটি বিপ্লবী পার্টি। বিপ্লব তার মুখ্য Agenda, পার্টিটি যদি সংস্কারপন্থী বা উদারপন্থী বুর্জোয়া পার্টি হয়, তাহলে তার বিপ্লবের কোনো দায় থাকে না। ঐতিহাসিক কোনো একটি পর্যায়ে নেগোসিয়েশন তার মুখ্য কর্মসূচি হতেই পারে। কিন্তু 'কমিউনিস্ট পার্টি' যখন এই কথা বলে, তখন তাকে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে এই কর্মকাণ্ড তার সামগ্রিক বিপ্লবী লড়াইকে কীভাবে সাহায্য করবে। কীভাবে আজকের দরকষাকষির পর্যায় থেকে সামগ্রিক আন্দোলনকে বিপ্লবী অভিমুখ দেওয়ার ভাবনাচিন্তা সেই পার্টি করছে।

দুঃখের বিষয়, সেসব ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন না। 'বিপ্লবী কর্মসূচি' শব্দটা তাঁদের কাছে একটি ভিনগ্রহের শব্দ। ওই কথা বললেই তাঁরা 'এই রে, মাওবাদীরা এসেছে'— বলে গাল পাড়তে শুরু করেন। কিন্তু ঘটনা তো তা নয়। মাওবাদীদের এখুনি জনযুদ্ধের ডাক দেওয়া যদি হঠকারী হয়ও, সিপিআইএম-এর 'কবে বিপ্লব কে জানে?'— এই বক্তব্য কোনো মার্কসবাদপ্রসূত বিপ্লবী বক্তব্য নয়। বিপ্লবী পরিস্থিতি এখুনি নাও থাকতে পারে, বিপ্লবী পরিস্থিতি কমিউনিস্টদের ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি হবে— তাও নয়, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইকে ভোঁতা করে দেওয়ার কর্মসূচি যদি কোনো কমিউনিস্ট পার্টির লাইন হয়, তবে তো সেই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবী পরিস্থিতি কোনোদিনই আসবে না! সমাজের অভ্যন্তরীণ নিয়ম এবং তারই সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী দিশা প্রদানের চেষ্টা— এই দুয়ের সম্মিলনেই কেবল বিপ্লবী পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে। সেই বিপ্লব কেমন হবে, সেই দিশায় পরিচালিত সংগ্রামের আজকের রূপ কী হবে, সে সবই বিতর্কযোগ্য। সংগ্রামের রূপ 'দরকষাকষিই' হোক বা 'সশস্ত্র সংগ্রামই' হোক, আলোচনাটি সামগ্রিক বিপ্লবী দিশার নিরিখেই করতে হবে, যদি সেই পার্টি নিজেকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলে দাবি করে থাকে।

পরিশেষে, আমরা যা বলতে চাই

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যখন সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম-এর জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না তখনই শাসকদলের থেকে বিরোধীদের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে— তাহলে

বিকল্প কী? যেন বিকল্প বললে তবেই বিরোধিতার অধিকার আছে, যতক্ষণ না বিকল্প দিতে পারছেন, ততক্ষণ আমি অন্যায় করলেও চুপ করে দেখুন। হ্যাঁ, বিকল্পের আলোচনা অনস্বীকার্য। কিন্তু গোটা সমাজ জুড়ে সেই আলোচনা শুরুর প্রাকশর্ত হল একটি সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া যে— এই পরিস্থিতির কোনো রেডিমেড বিকল্প হয় না। একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হয় মাত্র। সেটি হল বিনাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বা বৃহৎপুঁজির পায়ে আত্মসমর্পণ না করার দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে শুরু করলে অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই বিকল্প কর্মসূচি বেরিয়ে আসবে। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব রাজ্যে শিল্পায়নের প্রশ্নে যে পথে হাঁটছেন, সেটি চেনা পথ। কারণ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্য সরকারও কম-বেশি সেই পথেই হাঁটছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বা বৃহৎপুঁজির এই নতুন আক্রমণ, যা কিনা হাজার হাজার একর জমিতে কৃষকের বদলে বিশ্বপুঁজির অধিকার চায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে কী করে শ্রমিক-কৃষক তথা মেহনতি মানুষের রাজ্যব্যাপী, দেশব্যাপী নতুন বিপ্লবী লড়াই গড়ে উঠতে পারে, সেটিই হওয়া উচিত যে-কোনো বামপন্থী বিকল্পের আলোচনার মূল ভরকেন্দ্র। আর সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ঠিক করতে হবে কোনো একটি রাজ্য সরকারের কর্তব্য; লড়াইয়ের সামগ্রিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, সেই লড়াইকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নিয়েই যা সমাজে হাজির হবে। এই বিকল্পের পথটি তাই এখনো মূলত অচেনা, অদেখা। স্বাভাবিকভাবেই, কঠিন সেই রাস্তায় হাঁটতে নামার আগেই, যদি কোনো সরকারের মূল কর্মসূচিই হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিপতিদের কাছে নিজেকে ‘investment freindly’ করে তোলা, তবে তো সে এই বিকল্প অন্বেষণের লড়াইতে নামার আগেই হেরে বসে আছে! এই সত্যের স্বীকৃতি প্রয়োজন। বিকল্প অনুসন্ধানের কাজটি গোটা সমাজ জুড়ে শুরু হোক— আমরাও তাতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী— কিন্তু তা কোনও মিথ্যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে তো নয়ই, বরং তাকে নাকচ করে।

● অনিন্দিতা সান্যাল

শিল্পায়ন: ভবিষ্যতের ভিত্তিহীন স্বপ্ন

দুই আর দুই-এ চার হয় এটা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। আমাদের সাধারণ ধারণাটাও সে-রকমই। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে তো পাগলামি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের নামে যা হচ্ছে তাতে এই প্রশ্নটাকেই আরও একবার তলিয়ে দেখা দরকার।

একটু ভাবলেই দেখা যাবে, দুই আর দুই-এ চার হয়, এটাকে যতই স্বতঃসিদ্ধ (axiomatic) বলে চালানো হোক না কেন তা মোটেই ঠিক নয়। কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রেই মাত্র তা চলে, সবক্ষেত্রে নয়। যেমন ধরুন, দুটো ছাগল আর দুটো মানুষ মেলালে ...? কী বলবেন, চারটে ছাগল না চারটে মানুষ? হাস্যকর শোনালেও, এটাই সম্ভবত এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কারণ, ঠিক এ-রকম একটা সমীকরণ থেকেই সমস্ত বিভ্রান্তির সূত্রপাত।

এ-রকম একটা সমীকরণকে স্বতঃসিদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করা যে মূর্খামি তা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষজন অনেক সময় গুলিয়ে ফেললেও ‘গরু-ছাগলের কারবারি’, ‘দিন আনা দিন খাওয়া’ মানুষগুলো তা বিলক্ষণ বোঝে। আর বোঝে বলেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-ভাঙড়-বার্নপুর ‘শিল্পায়ন = উন্নয়ন’, এই হিসেবটা মেনে নিতে রাজি নয়। যতই বোঝানোর চেষ্টা হোক না কেন যে এই সমীকরণটা অবিসংবাদিত, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা অন্য কথাই বলে। তাই, এসব অঞ্চলের মানুষরা রাজ্য সরকারের শিল্পায়ন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্টের পুঁজিবাদী শিল্পায়ন ধামাকার বিরুদ্ধে এদের স্বতঃস্ফূর্ত/সংগঠিত প্রতিবাদকে যতই অযৌক্তিক (irrational) ‘উন্নয়ন বিরোধিতা’ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হোক না কেন মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেরও কিন্তু একটা দাম আছে।

ওই সব অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের নামে তাদের জমি ছিনিয়ে তৈরি হওয়া দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, ইস্টার্ন বাইপাস (কলকাতার) কিংবা ইস্কোর কথা ভালই বোঝেন। এসব তাদের জীবিকা খেয়েছে, কিন্তু দিয়েছে খুব সামান্যই। তাই তারা সরকারের উন্নয়নের গল্পকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। অথচ শিক্ষিত সমাজ সেই

গল্পেই মজে আছে। আর এর সঙ্গেই চলছে 'বাবু'দের পত্র-পত্রিকার অবিরাম প্রচার।

কতকগুলো কথা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরেই নেওয়া হচ্ছে। যেমন পুঁজিবাদী শিল্পায়ন হলে উন্নয়ন হবে। শিল্পায়নের ফসল একেবারে নিচু-তলা অবধি চুঁইয়ে নামবে ('trickle down'), সব মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতি ঘটবে। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নজরদারি করাই, যাতে কিচ্ছু বেনিয়ম না হয়। খুব বেশি হলে সরকার পরিকাঠামো নিয়ে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। উন্নয়নের বাকি কাজটা করে দেবে বাজার। ধরে নেওয়া হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে, বড় আধুনিক শিল্পের পাশাপাশি অঞ্চলেই গড়ে উঠবে অসংখ্য ছোট অনুসারি শিল্প। সব মিলিয়ে অনেক দক্ষ-অদক্ষ মানুষ চাকরি পাবে। বেকারত্ব ঘুচবে, আয় বাড়বে। তার সঙ্গেই বিস্তৃত হবে পণ্যের বাজার। ফলে আরও বিনিয়োগ, আরও উন্নয়ন। অন্যদিকে, সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাকি এই শিল্পায়ন, পরিকাঠামো-নির্মাণ ইত্যাদির কারণে উচ্ছেদ হওয়া বহু মানুষের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। পুনর্বাসনে কিছুটা সাহায্য করা। আরও একটা কথা এই গল্পটার পেছনে আছে যাকে বলে 'corporate social responsibility'। অর্থাৎ, পুঁজিপতিও বেশ কিছু সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করবে। যুক্তি এটাই, দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়ন করতে হলে, এমনকী মুনাফা তৈরি আর পুঁজি সঞ্চয়ন (capital accumulation) মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও, পুঁজিপতিদের কিন্তু সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিতেই হয়। না হলে, সামাজিক স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকেই থামিয়ে দিতে পারে। এতে পুঁজিপতিরই ক্ষতি। তাই পুঁজিপতিকে এ দায়িত্ব নিতে হবে।

এই সব ধরে নেওয়াগুলোর উপর ভিত্তি করেই রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের পুঁজিবাদী শিল্পায়ন প্রচেষ্টা। সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজি আর পুঁজিপতির খোঁজে নেমে পড়েছে রাজ্য সরকার, বিশেষত কতিপয় মন্ত্রী আমলা। বলা হচ্ছে, পুঁজি এলেই কাজ, কাজ মানেই উন্নয়ন। কার পুঁজি, কীসের শিল্প, কার কাজ, কতটা কাজ, কীভাবে উন্নয়ন এসব প্রশ্নগুলো যেন অবান্তর হয়ে গেছে। কেবল একটা কথাই সত্য 'পুঁজিবাদ = শিল্পায়ন = উন্নয়ন'!

এই পদ্ধতির একটা সুবিধে আছে। তর্কটাকে প্রথমেই বেঁধে দেওয়া যায়। একবার বেঁধে দিতে পারলে বাকি যুক্তিগুলো এমনিই বেরিয়ে আসে। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। পুঁজিবাদী, বাজারভিত্তিক শিল্পায়ন মানেই উন্নয়ন, এটা যদি একবার স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তবে হাতে থাকে আর একটাই কথা, সেটা ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসন প্যাকেজ। তর্কের গন্ডিটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়।

এটা একটা রাজনীতিই। এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে উন্নয়ন ও পুঁজিবাদী শিল্পায়নের সমীকরণ থেকেই চলে আসবে উচ্ছেদের প্রসঙ্গ। বিস্তৃত উন্নয়নের জন্য দরকার ব্যাপক শিল্পায়ন। এই শিল্পায়ন করতে হলে পুরনো অর্থনৈতিক বৃত্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো (institutions) পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তনের চাহিদাতেই হবে উচ্ছেদ। গল্পটা যেন সেই জীর্ণ পুরাতন ভেঙে নতুনের আবাহন ইত্যাদি। উচ্ছেদ হলে, প্রশ্ন উঠবে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসনের। তাই শুরুটা নির্ধারণ করে দিলে বাকিটা খানিক স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেরিয়ে আসবে।

একই সঙ্গে আছে দ্বিতীয় রাজনীতিটা। এই গল্পটাকে বিশ্বাস করিয়ে নেওয়ার রাজনীতি। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে একে সর্বজনীন করে দেখানোর চেষ্টা। অর্থাৎ এই

শিল্পায়নের মানে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানি, দুজনেরই না কি উন্নয়ন— সবার উন্নয়ন। সেই 'মেরা ভারত মহান' কিংবা 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর মতোই সবার মধ্যে একটা মিথ্যে বোধকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা 'false identity' তৈরির চেষ্টা— এত সব নাকি 'আমাদের জন্য'! এভাবে নাকি বাঙালি ইস্পাত শিল্পে (পড়ুন ইস্কো), মোটর গাড়ি শিল্পে, সফটওয়্যারের পরিষেবায় এমনকী শিল্প-সংস্কৃতিতে আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অন্তত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় তেমন শোনা গেল।

একবার এই বোধটাকে তৈরি করতে পারলে সবার সম্মতি/সমর্থন পেতে অসুবিধে হয় না। বড় পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ছোটখাট দোকানদার, সংগঠিত/অসংগঠিত শিল্প ও পরিষেবার শ্রমিক-কর্মচারী এমনকী কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর সবাইকেই দলে পাওয়া যায়। বাকি থাকে কিছু মানুষের জীবিকা পরিবর্তনের প্রশ্নটা (যা আসলে উচ্ছেদ)। আর এভাবে গল্পটাকে দাঁড় করাতে পারলে বিরুদ্ধতার পরিসরটা শুধু পরিমাণগত ভাবেই নয়, গুণগতভাবেও অনেক ছোট হয়ে আসে। দর-কষাকষিটা তখন চলতে পারে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসন নিয়ে। আর সেটাতো বাজারের মধ্যে থেকেই দাম নিয়ে দরাদরির মতো পুঁজিবাদী শিল্পায়ন = উন্নয়ন-এর রাজনীতি পরিধির মধ্যেই বাদানুবাদ।

এভাবেই তৈরি হচ্ছে এক নতুন পদ্ধতি যাকে বলা যায় 'dialogical approach' (dialectical নয়, যেখানে বাদানুবাদের ভেতর দিয়েই তৈরি হবে পথ)। এই প্রক্রিয়ায় সুচতুরভাবে আনা হচ্ছে শ্রেণি সমন্বয়ের প্রশ্নটা। বামফ্রন্ট সরকার বিশেষত সিপিআইএম মুখে শ্রেণি সংগ্রামের কথা বললেও তলে তলে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে 'বন্ধু পুঁজিবাদ' ('crony capitalism')-এর বোধ। এটা হয়ত ঠিকই যে আজকের পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলো ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আর তার সঙ্গেই শ্রেণি অবস্থানগুলোও অনেক জটিল। ফলে শ্রেণি কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্নির্মাণের প্রশ্নগুলো উঠে পড়েছে। শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির পরিধিটার প্রসারের দাবি উঠেছে। এই জটিলতার সুযোগটাকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে রাজ্যের সিপিআইএম পার্টির একটা অংশ। তাই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবন দেওয়াকে তারা বিদ্রূপ করে চলেছে অশালীনভাবে। এটা আসলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, বর্গাদার, ক্ষেত-মজুর আর তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছোট ছোট ব্যবসা করে খাওয়া মানুষগুলোর শ্রেণি অবস্থানের বহিঃপ্রকাশকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। তাই কেবলই হাস্যকরভাবে 'বহিরাগত' প্রসঙ্গে টেনে আনা যাতে এত সব লড়াইকে অর্থহীন করে তোলা যায়।

এই রাজনৈতিক চালাকিটার ভিত্তি বিশেষ অর্থনৈতিক যুক্তি নির্মাণ। প্রাণপণ প্রতিষ্টা করার চেষ্টা হচ্ছে বাজার ভিত্তিক পুঁজিবাদী শিল্পায়ন ও উন্নয়নের সমীকরণ। বলা হচ্ছে, কৃষিতে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা খুবই সীমিত। কিন্তু কৃষির ওপরই রয়েছে বিশাল জনসংখ্যার চাপ। তাই কৃষিকে ভারমুক্ত করতেই হবে। অর্থাৎ কৃষির উদ্বৃত্ত মানুষজনকে অন্য কোথাও নিয়োগ করতে হবে তাদের ব্যক্তিগত এবং একই সঙ্গে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির কথা মাথায় রেখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মতোই দাঁড় করানো হচ্ছে পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়নের যুক্তি। এই শিল্পায়ন নাকি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির

উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করে দেবে। অর্থাৎ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মানুষের আয় বাড়বে।

প্রথমেই মনে রাখা উচিত কৃষি থেকে শিল্পে 'উত্তরণ'-এর এই মডেল অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন এবং পৃথিবীর বহু দেশের অভিজ্ঞতাই একে ভুল প্রমাণিত করেছে। আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা-নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলোকে কী নিদারুণ দাম দিতে হয়েছে এই 'উন্নয়ন'-এর তা সারা পৃথিবী জানে। এসব নিয়ে লেখাপত্রেরও অভাব নেই। একই অভিজ্ঞতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও। আধুনিক শহর ভিত্তিক শিল্পায়নের ফসল সমাজের উঁচু-তলা থেকে বাজারের মাধ্যমে চুঁইয়ে পড়ার ধারণাটা কার্যকর হয়নি। পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ফল ভোগ করেছে মূলত উপর তলা। গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে পুরনো শহর বা নবনগরীতে আসা মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের আয়তন বাড়িয়েছে। সরকারি হিসেবমতো দারিদ্র্যের হার কমেছে (যদিও এনিয়ে প্রচুর আলোচনার অবকাশ আছে)। কিন্তু অসাম্য-বৈষম্য বেড়েছে বহুগুণ। এসব এমনকী অর্থনীতির স্নাতক স্তরের ছাত্রদের কাছেও খুব স্পষ্ট। অথচ রাজ্য সরকার সেই পুরনো মডেলটাই আমদানি করার কথা বলতে শুরু করল।

আধুনিক শিল্প হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে এই দাবিটাকে একটু তলিয়ে দেখা উচিত। প্রথমত, আধুনিক শিল্পে কাজের সুযোগ কম কারণ তা পুঁজি নিবিড়। কর্মসংস্থান যা তৈরি হবে মূলত তা বাইরের অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সেখানে না আছে বলার মতো আয় না কাজের নিশ্চয়তা। আর এটাই যে হবে তা লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ এমনকী আমাদের দেশেও কর্নাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট। সর্বত্রই ঠিকা শ্রমিকের অনুপাত দ্রুত বাড়ছে। সর্বত্র চলছে ঠিকাকরণ আর ঠিকা শ্রমিক শোষণ। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় সার্বিক আয় বাড়বে খুব কমই (কারণ কর্মসংস্থানের মূল উৎস তো অসংগঠিত ক্ষেত্র, সেখানে আয় সামান্যই)। ফলে, প্রথম ধাক্কার শিল্পায়নের প্রভাবে সার্বিক আয় বেড়ে আরও নতুন শিল্পের চাহিদা তৈরি করবে, সে সুযোগ সামান্য। তৃতীয়ত, আধুনিক শিল্পে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রচুর মুনাফা তৈরি হলেও সেই মুনাফাতে আবার রাজ্যেই বিনিয়োগ হয়ে নতুন শিল্প, নতুন কর্মসংস্থান হবে তার কোন রকম গ্যারান্টিই নেই। আধুনিক পুঁজি-নিবিড় শিল্প প্রচুর উৎপাদন, প্রচুর মুনাফা তৈরি করলেও তা যে নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সৃষ্টি করতে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এই মুনাফার একটা বিরাট অংশ চলে যায় ফাটকা বাজারে, অন্তত আমাদের দেশের হিসেবটা সেরকমই। আর উদ্বৃত্ত পুঁজি যদি সব সময় বিনিয়োগই হবে তাহলে আমাদের ব্যাঙ্কগুলো পাহাড় প্রমাণ পুঁজি নিয়ে বসে আছে কেন? সুদ কমিয়েও বিনিয়োগ না বাড়াতে পেরে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোন, গাড়ির লোন নেওয়ানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলো আমাদের পেছন পেছন ধাওয়া করছে কেন? আসলে, পুঁজি খুঁজে বেড়ায় আরও আরও মুনাফার উৎস। যেখানে মুনাফার হার বেশি, পুঁজি সেখানেই যাবে। কোন বিশেষ রাজ্যের প্রতি কিংবা সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এমন শ্রম-নিবিড় পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি তার কোন রকম দায়বদ্ধতা নেই। বিনিয়োগকে বিস্তৃত করে সাধারণের সস্তা ভোগ্যপণ্য তৈরি করা,

সর্বোপরি আরও আরও কর্মসংস্থান তৈরি করাই পুঁজির কর্তব্য, এটা যারা ভাবছেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তারা পুঁজির যুক্তিটাই বুঝছেন না। সাধারণের ভোগ্যপণ্য কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য ভরসা সেই অল্প আয়ের অসংগঠিত ক্ষেত্র। সেখানে আধুনিক শিল্পের গ্ল্যামার চুঁইয়ে নামে না।

আধুনিক শিল্পে পুঁজি-নিবিড়তার কারণে 'দক্ষ' শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেশি। ফলে, অল্প শ্রমিক নিয়োগেই বিপুল পরিমাণ পণ্য ও উদ্বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব। পরবর্তী পদক্ষেপ হল ওই পণ্য বাজারে বিক্রি করা এবং খরচাপাতি মিটিয়ে মুনাফা অর্জন। এই বাজার এখন দেশের এমনকী পৃথিবীর সর্বত্র। তাই রাজ্যে শিল্প হলে পণ্য পেতে সুবিধে হবে, এটা হাস্যকর যুক্তি। পুঁজিপতি যেখানেই ভাল দাম পাবে সেখানেই পণ্য বেচবে। সেই পণ্য হলদিয়া কিংবা হনলুলু কোথায় উৎপাদিত তা অবান্তর। আর কাঁচামাল যে-কোন জায়গা থেকেই আনা যায়, যেমন সিঙ্গুরের কারখানার স্টিল আসবে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে। আসলে ভাঙর বা সিঙ্গুরে কারখানা হলে লাভ এটাই যে ওই কারখানায় কিছু 'দক্ষ' শ্রমিকের কাজ জুটবে। আর কারখানার বাইরে যে কর্মসংস্তান হবে তা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রেই। আধুনিক শিল্পে বিপুল মূল্যযোগের (Value added-এর) একটা অংশ কারখানার ভেতরের শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটায় তাদের আয় বাইরের 'অদৃশ্য' শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি। অর্থনীতির তত্ত্বের সঙ্গেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ। পুঁজির নিরিখে দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে পুঁজির প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে কিছু তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকেরও কাজ জুটতে পারে। কিন্তু মুনাফার আঞ্চলিক পুনর্বিনিয়োগ এবং এ-প্রক্রিয়ায় একটা অঞ্চলের মধ্যেই আরও আরও কর্মসংস্থান ক্রমাগত তৈরি করে চলা, অর্থনীতির কোন্ তত্ত্বে এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কথা বলা আছে তা সরকারের ধামাধরা অর্থনীতিবিদ্‌রা ব্যাখ্যা করলে বুঝতে সুবিধে হয়। পুঁজি বিনিয়োগ মানে কিছু 'দক্ষ' শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি। এটা মানা যায়। কিন্তু তার মানেই এ-পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া মুনাফার ক্রমাগত বিনিয়োগ ও বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনীতির তত্ত্বের নিরিখেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যে-সব তাত্ত্বিক 'পুঁজিবাদী শিল্পায়ন = উন্নয়ন' এই ধারণা প্রচার করছেন অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললে বলতে হয় তারা তাত্ত্বিকভাবে অসৎ।

কেউ বলতে পারেন, একবার এই প্রক্রিয়া শুরু হলে একটা আশার সঞ্চার হবে। ফলে অনুকূল পরিবেশের লোভে আরও আরও শিল্প আসবে; ক্রমাগত নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে। এর উত্তরে বলা যায়: প্রথমত, এই বিনিয়োগে কর্মসংস্থান তেমন একটা হবে না। যেটুকু হবে তার বেশির ভাগটাই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে বিস্তৃত বাজার তৈরি হবে না। বাজারের অপ্রতুলতার কারণে পণ্যের চাহিদাও তেমন বাড়বে না। ফলে নতুন বাজারের লোভে— নতুন বাজার ধরতে বিনিয়োগ হবে (যেমন রিলায়েন্স-এর কৃষিপণ্য বাজারে ঢোকা কিংবা সালিম গোষ্ঠীর অন্যান্য পরিষেবার অনুপ্রবেশ) সে সুযোগ খুবই সীমিত। আর পরিষেবার সীমিত বাজার পেতে যাও বা কিছু বিনিয়োগ আসতে পারে, শিল্প পণ্যের চাহিদা মেটাতে এখানেই নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অন্য আর যে কারণে নতুন শিল্প আসতে পারে, সেটা হল প্রাথমিক শিল্পায়নের

ধাক্কায় তৈরি হওয়া কিছু নতুন পরিকাঠামো কিংবা সস্তায় প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল-জমি পাওয়ার সুযোগ। কিন্তু এ-সুযোগ সীমিত। অন্যান্য শিল্পোন্নত রাজ্যে পরিকাঠামোর সমস্যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। আর বেসরকারি পুঁজি পরিকাঠামো তৈরির থেকে সরকারের বানিয়ে দেওয়া পরিকাঠামো (যেমন রেল, রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ) ব্যবহার করাই বেশি পছন্দ করে। তাতে অনিশ্চয়তা কম, ব্যয়ও কম, প্রাথমিকভাবে বিপুল বিনিয়োগের ঝক্কিও নেই। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার রাজ্যের দ্রুত সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। এই সব বাধা পেরিয়ে ৭৫ লক্ষ-কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে আর তার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের ৭৫ লক্ষ নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের চাকরি জুটবে এটা ভাবা কী অলীক কল্পনা নয়! মনে রাখতে হবে যে যা বিনিয়োগ আসছে তাতে মোটামুটি ১ কোটি টাকায় ১-২ জনের চাকরি হবে। গত দশ বছরের ২৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে রাজ্যে সরাসরি চাকরি হয়েছে ৬০ হাজার মানুষের।

অনেকেই এই সূত্রে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রসঙ্গ আনছেন। এটা অবাস্তব তুলনা। এক কথায়, সেই শিল্প বিপ্লব পরিণত হয়েছিল ব্যাপক অভ্যন্তরীণ উচ্ছেদ, বিশাল মহাদেশ জোড়া উপনিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ আর এই বিরাট উপনিবেশকেই বাজার হিসেবে ব্যবহার করে। আবার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পের উপর বেকারত্বের চাপও কিছুটা কমানো হয়েছিল। সবেচেয়ে বড় কথা ওই শিল্পায়ন ঘটেছিল দু'শ বছর ধরে গড়ে ওঠা কৃষি-বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে। কৃষি-বৃদ্ধি, বহির্বাণিজ্য এবং বিপুল ঔপনিবেশিক লুঠতরাজের ফসল শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় যে ভয়ঙ্কর অভিঘাত ও ব্যাপ্তি তার সঙ্গে আজকের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির কোন তুলনাই হয় না। আর পশ্চিমবঙ্গ তো একটা অঙ্গরাজ্য মাত্র। তার জোরের জায়গা আলাদা, সমস্যা অনেক অনেক জটিল। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই রাজ্য সরকার ধার করা শিল্পায়ন অর্থাৎ বাইরে থেকে পুঁজি এনে উন্নয়ন বৈতরণী পার হতে চাইছে। তাই যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলেছে এই সব উদাহরণ।

কিন্তু বামফ্রন্টের এত-দিনকার শ্রেণিভিত্তি (ভোটভিত্তি) হল কৃষির সঙ্গে যুক্ত নানা বর্গের মানুষ। তাই কৃষিকে একেবারে বাদ দিলে বিপদ। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবস্থা শোচনীয়। এবং তা তথ্য আকারে সর্বসমক্ষে আসতে শুরু করেছে। তাই একদিকে ক্ল্যাসিকল অ-মার্কসীয় উন্নয়ন মডেলের অনুকরণে কৃষির থেকে চোখ ফিরিয়ে পুঁজিবাদী শিল্পায়নের কথা বলা, অন্যদিকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের ভোটকে অটুট রাখার চেষ্টা। এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে সিপিআই-এম চালিত বামফ্রন্ট সরকার একটা স্লোগান খুব চালাকি করে আমদানি করেছে— "কৃষি ভিত্তি/শিল্প ভবিষ্যত"-এর গল্প।

এই স্লোগানের চড়া প্রচারের আড়ালে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে কৃষির শোচনীয় অবস্থাটাকে। অন্যদিকে, রাজ্যের সব শ্রেণির মানুষকে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গল্প বলা হচ্ছে, যার মূল ভিত্তি নাকি বাজার কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী শিল্পায়ন। রাজ্য সরকার সুচতুরভাবে এই শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে কৃষি-সমস্যাগুলো এড়িয়ে যেতে চাইছে। এতদিন মূলত কৃষিতে নিযুক্ত নানা বর্গের মানুষের ভোটের উপর দাঁড়িয়ে সরকার চালানো সত্ত্বেও কৃষির সত্যিকারের সমস্যাগুলোর পর্যালোচনা এবং সমাধানের ব্যাপারে

সিপিআইএম-এর এই চূড়ান্ত দায়সারা ভাব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এক্ষেত্রে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্তব্য তো দূরের কথা। সিপিআইএম দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সংগঠনের কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। বরং সমস্যাগুলোকে ঔদ্ধত্য দিয়ে চেপে দেওয়া চেষ্টা করছে।

ভারতের কৃষি এ-মুহূর্তে কতকগুলো অত্যন্ত জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছে। WTO-র চুক্তি মেনে ভর্তুকি কমানোয় সার-কীটনাশক-বিদ্যুৎ ইত্যাদি উপকরণের দাম বাড়ছে হুহু করে। চাষের খরচ বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে কৃষিপণ্যের উপরও যে ভর্তুকি থাকত তা কমানো হচ্ছে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করে। ফলে, কৃষিপণ্যের বাজারের পরিধি কিংবা পণ্যের দাম কোনটাই আর নিশ্চিত নয়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু কৃষিপণ্যের অবাধ আমদানি। উন্নত দেশের বিপুল ভর্তুকি পাওয়া সে ফসল আমাদের দেশীয় কৃষিপণ্যের বাজারে ঢুকে কৃষকের সর্বনাশ করছে। এর উপর আবার একদিকে সবুজ-বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুফলগুলো ধরে রাখা যাচ্ছে না আর অন্যদিকে, পরিবার ভাঙ্গার ভেতর দিয়ে জমির ব্যাপক খণ্ডীভবন হচ্ছে। কৃষি আর তেমন আয় দিতে পারছে না। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্ভর ভারতীয় কৃষি ধুঁকছে। এটা পশ্চিমবঙ্গেরও সমস্যা। সিপিআইএম এখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাণ-ভোমরা। অথচ, মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকলেও কৃষির এই গভীর সমস্যার মূল উৎস WTO-র মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সেটা জেনেও তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তোলেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের তোষণমূলক নীতি বদলাতেও চাপ দেয়নি। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে কৃষি সমস্যা থেকে নজর ফেরাতে চেয়েছে।

অন্যদিকে বামপন্থী দল হিসেবে নিজেকে জাহির করলেও ভূমিসংস্কারের পরবর্তী যে-সব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কৃষিকে নিয়ে যেতে হয় তার ধারপাশ দিয়েও সরকার চলেনি। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার কিছুটা সাফল্য পেলেও তা সুযোগ কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। একটা হিসেব একটু দেখা যাক।

প্রথমেই বলা উচিত যে আটের দশকের মাঝামাঝিই রাজ্যের ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়া প্রায় থেমে এসেছিল (অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৪ তাই বলছে)। ২০০০ সালে মোট নথিভুক্ত বর্গাদার ছিল ১৬·৮ লক্ষ, যা পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষিজীবী পরিবারের ২০·২ শতাংশ। আর বর্গা রেকর্ড করা জমির পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ একর, রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ৮·২ শতাংশ। মনে রাখতে হবে রাজ্যের মোট কৃষিযোগ্য জমির মোটামুটি ২০ শতাংশ ভাগচাষের আওতায়, তাই বর্গারেকর্ডের উপযুক্ত। অর্থাৎ বর্গা রেকর্ড করা জমির পরিমাণ মোট সুযোগের অর্ধেকেরও কম! অন্যদিকে, ২০০৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ১১ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গরিব ও প্রান্তিক ও কৃষকের মধ্যে বণ্টন করেছে। বণ্টিত জমির অর্ধেকের বেশি (৬ লক্ষ একরের কিছু বেশি) ৭৭-এ বামফ্রন্ট জমানা শুরু হওয়ার আগেই 'বেনামি দখল' হয়েছিল কৃষি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট জমানায় ৫ লক্ষ একরের কম জমি বণ্টন হয়েছে। অথচ মোট খাস জমির মধ্যে ৩ লক্ষ একর বণ্টন হয়নি। বরং ১৩·২৩ শতাংশ পাট্টাদার জমি হারিয়েছে

এবং ১৪·৩৭ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ চাষ ক্রমশ অলাভজনক হয়ে পড়ায় জমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি শ্রমিকদের ৪৫ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অবস্থা যে সারা দেশের তুলনায় মোটেই ভাল নয় তা বোঝা যায় আরও কিছু তথ্য থেকে। ২০০০ সালে ভারতের গ্রামীণ মাথা-পিছু ব্যয় ছিল মাসে ৪৮৬ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ৪৫৪ টাকা। ওই সময়ে ভারতের গ্রামে বেকারীর হার ছিল ১·৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ২·৭ শতাংশ; দারিদ্র্যের হার ভারতে ২৭·০৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩১·৮৫ শতাংশ। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের অবস্থান ১৬ নম্বরে। সেচ-এর দিক দিয়ে এ রাজ্যের অবস্থান ৯ নম্বরে। গ্রামীণ সমবায়ের উন্নতির দিক থেকে দশম আর স্বনিযুক্তি প্রকল্প রূপায়নের নিরিখে অষ্টম। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ঋণের মোট প্রয়োজনের মাত্র ২৯ শতাংশ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। আর ক্ষুদ্রশিল্পে এই অনুপাত মাত্র ৪০ শতাংশ! এসব দেখলে রাজ্য সরকারের কৃষি ভিত্তির শ্লোগান মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর।

এই কঠিন অবস্থায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক আর বর্গাদার জমি বেচে দিতে, চাষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে গ্রামীণ কর্মী জনসংখ্যায় চাষির অনুপাত কমেছে ৩৮·৪ শতাংশ থেকে ২৫·৪১ শতাংশে। ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত; তার সঙ্গেই গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্রে যুক্ত মানুষ বেড়েছে ২৯·৩ শতাংশ থেকে ৪১·৫ শতাংশে। বামফ্রন্ট এ-অবস্থায় আরও জোরদার ভূমিসংস্কারের আর তারপর ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে খণ্ডিত খর্বিত কৃষিকে পুনর্গঠন করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর বদলে চুক্তি চাষ চালু করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিরাট দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনছে কৃষিপণ্যের বিপণনে। বলা হচ্ছে খাদ্যশস্য নাকি উদ্বৃত্ত, তাই চাষি দাম পাচ্ছে না। এখন একমাত্র উপায় না কি ফসলের বৈচিত্রায়ণ। শস্য চাষ ছেড়ে চাষিকে তৈরি করতে হবে ফল-সবজি ইত্যাদি। কারণ প্রক্রিয়াকরণের পর এসবের বাজার দেশে-বিদেশে ভালই। পুরো প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে করতেই নাকি চুক্তি চাষ দরকার। এতে উপযুক্ত উপকরণ, প্রযুক্তি পাওয়া যাবে, বাজারও থাকবে নিশ্চিত।

প্রথমত, বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে চুক্তি চাষে যুক্ত হলে চাষির স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না। তখন একচেটিয়া শোষণ শুরু হতেই পারে। দ্বিতীয়ত, এখনও বিরাট অংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচেই অবস্থান করে। ফলে শস্যের চাষ নেই এ-কথাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়ত, ফল, সবজি চাষে বৈচিত্রায়ণ হলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির ব্যক্তিগত খাদ্য-নিরাপত্তা বিপদের মুখে পড়তে পারে। আসলে, সমস্ত মানুষের খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাতে গেলে সত্যিই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকবে, এটা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে দু'একটা তথ্য খুব জরুরি। ২০০০ সালেও চীনে খাদ্যশস্যের ৭০ শতাংশ বাজার সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। চীন খাদশস্যের মজুত ভাণ্ডারের ব্যাপারে এখনও যথেষ্টই সাবধানী। অথচ আমাদের সরকার তড়িঘড়ি নেমে পলেছে কৃষি-বৈচিত্রায়ণের পথে। খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টা যেন তাদের কাছে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। আর একটা

তথ্য কৃষি নিয়ে বিতর্কে জরুরি। বলা হচ্ছে কৃষিতে উৎপাদন নাকি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। অথচ তথ্য অন্য কথাই বলছে। পশ্চিমবঙ্গে যখন হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন ২২০০ কেজি, তখন তা ইন্দোনেশিয়ায় ৪২৮৩ কেজি, পাকিস্তানে ৩০০০ কেজি, ভিয়েতনামে ৪১০১ কেজি আর চীনে ৬৩১৭ কেজি। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং তার যথোচিত বণ্টন সার্বিক খাদ্য-নিরাপত্তার জন্যই এখনও রাজ্যের মানুষের যথেষ্ট দরকারি।

গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ ও সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিতে কৃষির উৎপাদন ও বিপণনকে সংগঠিত করে বিপুল শক্তিকে সুসংহত করা যেত। সেই প্রক্রিয়ায় শুধু কৃষকই নয় কৃষি ও অকৃষিতে যুক্ত অসংখ্য খেটে খাওয়া মানুষের উপকার হত— উৎপাদক, বিক্রেতা, ক্রেতা সব হিসেবেই। আর শুধু কৃষি সমবায়ই কেন, বিশাল গ্রামীণ শিল্প ও পরিষেবাকে জড়িয়েই তো একটা কর্মযজ্ঞ তৈরি করা যেত। এভাবে কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি শিল্প-পরিষেবা নিয়ে উৎপাদন বিপণনের বিপুল আয়োজন করলে তা আর্থিক ক্ষমতার বিচারে বড় পুঁজিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এভাবে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কার্যকর কর্মসংস্থান হত। এই সম্ভাবনা যে কী বিশাল তা কয়েকটা পরিসংখ্যান দেখলে কিছুটা বোঝা যায়।

রাজ্য সরকার 'মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ' মারফত ফল-সবজির 'অনলাইন' কেনাবেচা শুরুর আয়োজন করেছে। এতে নাকি হাজার হাজার কোটি টাকার বিকিকিনি হবে। সহজেই বোঝা যায় কী বিপুল সংখ্যায় মানুষ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে এত দিন নানাভাবে যুক্ত ছিল। তাদেরকে সমবায়ের মধ্যে দিয়ে সংগঠিত করার বদলে সরকার পুরো ব্যাপারটাকে তুলে দিতে চাইছে রিলায়েন্স-আদানি-প্যান্টালুনস্ এমনকী ওয়ালমার্টের মতো বিরাট সংস্থার হাতে। যাতে করে চুক্তিচাষ— ফসলের বৈচিত্রায়ণ— প্রসেসিং— প্যাকেজিং— রিটেল ট্রেড-এর মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণ থেকে শুরু করে উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিক বিপণনে সবই বেঁধে ফেলা যায়। বলা বাহুল্য তা উৎপান-বিপণনে বিরাট কর্মচ্যুতি তৈরি করবে। সঙ্গে সঙ্গেই ওই সব প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণ ক্রেতার হাতের বাইরে চলে যাবে। একবার একচেটিয়াকরণ হয়ে গেলে তা থেকে বেড়িয়ে আসা কিন্তু খুবই কঠিন। এর সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসের প্রশ্নটাও থেকে যায়। খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বাইরে থেকে ডেকে আনা হচ্ছে বড় পুঁজিপতিদের, অথচ আমাদের রাজ্যে ইতোমধ্যেই এই শিল্পে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশের বেশি! বলা বাহুল্য এটা ঘটেছে ক্ষুদ্র কর্মসংস্থানের হাত ধরে যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্টই।

এই রকম অবহেলিত অথচ প্রচুর সম্ভাবনাময় গ্রামীণ উৎপাদন শিল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক। কৃষির সঙ্গে এই ক্ষেত্রের সম্পর্ক নিবিড়। এই দুই ক্ষেত্রকে ঘিরে সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠলে তার অভিঘাতে-সহায়তায় শুধু গ্রামেরই উন্নতি হবে না এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সঞ্চয়, কাঁচামাল ও বাজারের উপর নির্ভর করে রাজ্যে নিজস্ব শিল্পায়নের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ধার করা শিল্পায়নের তুলনায় তার ভিত্তি অনেক দৃঢ়।

তাই গ্রামীণ শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অথচ এই শিল্পের প্রায় পুরোটাই ক্ষুদ্র অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এ-জাতীয় উদ্যোগের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ২১ লক্ষের বেশি, আর

তাতে যুক্ত আছে ৪৪ লক্ষের বেশি মানুষ। এই দুটোর হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে এবং এখানে কর্মী সংখ্যা সারা দেশে গ্রামীণ শিল্পে নিযুক্ত মোট কর্মীর ১৮·৪১ শতাংশ। বিনয় কোঙারের মতো নেতারা যখন পশ্চিমবঙ্গের চাষযোগ্য জমির অনুপাত ভারতের এ রকম জমির মাত্র ৩·৮৮ শতাংশ বলে কান্নাকাটি করছেন, তখন এটা বলছেন না যে সারা দেশে গ্রামীণ শিল্পে কর্মসংস্থানের পাঁচ ভাগের প্রায় এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে। মাথাপিছু জমি কম, কিন্তু মানুষ প্রায় কোন রকম সরকারি সহায়তা ছাড়াই অর্থনীতির পথ করে নিয়েছে গ্রামীণ শিল্পে। এই শিল্পে মূল্যযোগ (value added)-এর নিরিখে কারখানা প্রতি আয় ভারতের গড়ের থেকে বেশিই, যদিও শ্রমিক-পিছু মূল্যযোগ দেশের গড়ের থেকে কম। কারণ সম্ভবত এটাই যে রাজ্যের এই শিল্প দেশের তুলনায় বেশ শ্রম-নিবিড়। আর এই গ্রামীণ শিল্পে মোট বার্ষিক আয় প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। তার মানে ওই দামের সমান পরিমাণ পণ্য এই শিল্প প্রতি বছর বেচে। আর এর একটা বড় অংশ বিক্রি হয় রাজ্যের গ্রামেই।

সিপিআইএম-এর কিছু নেতা ইদানিং বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে। সেই চাহিদা পূরণ করতেই আনা হচ্ছে বড় শিল্প ও পরিষেবা উৎপাদকদের। উপরের ১৪ হাজার কোটি টাকার গ্রামীণ শিল্প পণ্য বিক্রির হিসেবটা দেখলে সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে গ্রামীণ পরিষেবার বাজারটাকেও। এই পরিষেবার প্রায় পুরোটাই গ্রামের কিংবা মফস্বলের মানুষরা ব্যবহার করে। অর্থাৎ গ্রামীণ শিল্পপণ্য ও পরিষেবার বেশির ভাগটাই গ্রামেই বিক্রি হয়। আর এই বাজারের উৎস এই দুই ক্ষেত্রের পারস্পরিক চাহিদা এবং সর্বোপরি কৃষির আয়। অর্থাৎ গ্রামীণ শিল্প, পরিষেবা এবং কৃষি— সব মিলিয়ে একটা বিরাট টাকার লেনদেন চলে রাজ্যেরই গ্রামাঞ্চলেই। বাজারটা ২০ হাজার কোটি টাকার অনেক বেশিই। আর এই বাজারের লোভ দেখিয়েই ডেকে আনা হচ্ছে বড় শিল্প— পরিষেবা সংস্থাগুলোকে। সেটা তো মারাত্মক কথা! নেতারা বলছেন বাজার তৈরি হয়েছে, কিন্তু কীভাবে হয়েছে তা তাঁরা উহ্য রাখছেন। ওই উহ্য কথাটা পূরণ করলে যা বেড়িয়ে আসছে তা ভয়ঙ্কর।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষির আটের দশকের বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে নয়-এর দশক জুড়ে গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প ও পরিষেবা গড়ে উঠেছে। এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭-৮ শতাংশ! একথা রাজ্যের মানব উন্নয়ন রিপোর্টের (২০০৪) প্রণেতারাও পরিষ্কার করে লিখেছেন। তারা আরও বলেছেন যে এই সময়ে কিছু সংগঠিত শিল্পের ব্যাপক সংকোচন হয়েছে, ফলে পুরো সংগঠিত ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের অনুপাত ১২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৮·৭ শতাংশ। আর সংখ্যার বিচারে এই কমাটা প্রায় তিন লাখ। অন্যদিকে রাজ্যে ইতোমধ্যেই এক ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটেছে। যদিও তা ঘটেছে মূলত গ্রামে আর কৃষির উপর নির্ভর করেই। অবশ্য কৃষির উন্নতির গতি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্রের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়েছে। নয়ের দশকে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও পরিষেবা আর কৃষি-উৎপাদন-বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা রকম পরিষেবার চাহিদা বাড়ায় গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছিল। এখন সেই বাজারেরই সুযোগ নিতে চাইছে বৃহৎ

পুঁজি।

যদি অত্যাধুনিক শিল্প পণ্য কিংবা পরিষেবা দিয়ে বাজার ভরিয়ে দেওয়া হয় তবে তো গ্রামীণ শিল্প পরিষেবা ধ্বংস করেই তা করতে হবে। ঠিক যেমন-ভাবে বাংলার মসলিনকে প্রতিস্থাপিত করেছিল ম্যানচেস্টারের মিলের কাপড়। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির কতটা ক্ষতি হতে পারে? একটা হিসেব থেকে সেটা কিছুটা বোঝা যায়। যখন ১৯৯১ সালে রাজ্যের গ্রামে মোট কর্মীর ২৯·৩ শতাংশ যুক্ত ছিল অকৃষি শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে, তখন ২০০১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪১·৬ শতাংশ! আর কর্মীর সংখ্যাটা প্রায় ৬০ লাখ। অত্যাধুনিক দেশি-বিদেশি পণ্য গ্রামীণ বাজারে ঢুকে পড়লে ওই বিরাট সংখ্যক মানুষের যে সমূহ বিপদ হবে সে ইঙ্গিত এমনকী পশ্চিমবঙ্গ মানব উন্নয়ন রিপোর্টেও খুব পরিষ্কার।

মূলত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্ভর কৃষির আটের দশকের বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করেই গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্র বেড়ে উঠেছে। তাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্ভর কৃষিকে সুসংহত করার মধ্যে অনেকটাই লুকিয়ে আছে গ্রামীণ অকৃষির ভবিষ্যত। আবার এই অকৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি কৃষিকে যোগাতে পারে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আর দৈনন্দিন ব্যবহারের অসংখ্য পণ্য-সামগ্রী। ১৯৯১-২০০১ এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৬·৭৫ শতাংশ। এই হিসেবে কর্ণাটকের পরেই ছিল রাজ্যের স্থান। এই বৃদ্ধির একটা অংশ অবশ্যই এসেছিল কৃষি থেকে। যদিও কৃষি ইতোমধ্যেই তার আটের দশকের গতি অনেকটাই হরিয়েছিল। অদ্ভুত মনে হলেও এটা তথ্য যে নয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে একটা গতি এসেছিল। কিন্তু তা এসেছিল অসংগঠিত ক্ষেত্রের হাত ধরে। সংগঠিত ক্ষেত্রর এই সময়ে বরং সঙ্কুচিত হয়েছিল। রাজ্যের উৎপাদন শিল্পে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ভাগ আটের দশকের ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে নয়ের দশকে ৬০ শতাংশ হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প-পরিষেবা ভিত্তিক একটা সুসংহত প্রক্রিয়ার দিক থেকে দৃক্‌পাত না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন এক কর্মনাশা পথে হাঁটতে চাইছে। একদিকে চুক্তিচাষ— বৈচিত্র্যায়ণ— প্রক্রিয়াকরণ— রফতানি কিংবা কৃষিপণ্যের রিটেল ট্রেড আর অন্যদিকে গ্রামীণ অকৃষিক্ষেত্রের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে জুতে দেওয়ার আত্মঘাতী প্রয়াস। সরকার এই রাজ্যকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বৃহৎ পুঁজির অবাধ ক্ষেত্র করে তুলতে চাইছে।

গ্রামীণ কৃষি-অকৃষি মিলিয়ে একটা সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করা দূরে থাক, রাজ্য সরকার যে শিল্পায়ন পরিকল্পনা করছে তা এই উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ধ্বংস করবে। এটা এমনকী সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু বিশেষজ্ঞও বলছেন। কৃষি-অকৃষিকে সংঘবদ্ধ করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আশা ও উদ্যমকে তৈরি করার বদলে হাওয়ায় ভেসে উন্নয়ন পরিকল্পনা করছে পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে।

রাজ্য সরকার যে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে তা কোনও ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পোন্নয়ন পথের থেকে আলাদা কিছু নয়। ঠিকঠাক বললে তা বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দেশিত পথেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলা। এই জাতীয় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আমরা উন্নত এমনকী অনুন্নত দেশগুলোতে বহুদিন ধরেই দেখছি।

আমাদের দেশে তা শুরু হয়েছে আটের দশকের মাঝামাঝি আর অনেক বেশি গতি পেয়েছে ১৯৯১-এর সংস্কার লাভ হওয়ার পর। তাই ওই সব অভিজ্ঞতা রাজ্য সরকারের শিল্পায়ন গল্পের ভবিষ্যত বুঝতে কাজে লাগাতে পারে।

এ জাতীয় শিল্পায়ন অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ হল: কর্মহীন বৃদ্ধি (jobless growth) যা খুব সম্প্রতি এমনকী রাষ্ট্র সংঘও স্বীকার করে নিয়েছে। সারা পৃথিবীতে বিশেষত অনুন্নত দেশে গত এক দশকে বৃদ্ধির হার বেশ বেশি (৬·৫-৭·৫ শতাংশ)। তবুও নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে খুবই কম। ভারতের ছবিটাও এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এই সময়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৫·২ শতাংশ। আর ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০, এই সময়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬·৭ শতাংশ। অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার প্রথম পর্যায়ে ২·৭ শতাংশ থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ১·১ শতাংশে! অর্থাৎ ১৯৮৩-৯৩ দশকের তুলনায় ১৯৯৪-২০০০ এই সময়ে বৃদ্ধির হার বেড়েছে অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হয়ে গেছে অর্ধেকেরও কম। এই ছবিটাই অন্যভাবে দেখা যায় কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৮৩-১৯৯৩ দশকে যেখানে ১ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়লে চাকরির হার বাড়ত ০·৫ শতাংশ, ১৯৯৪-২০০০-এ তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ০·২ শতাংশে। অর্থাৎ ১০ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়লে মাত্র ২ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে। অর্থনীতিবিদ্ এবং পরিকল্পনা রূপায়ণকারীরাই হিসেব করে দেখেছেন যে জাতীয় উৎপাদন/আয় বাড়ার হার ৮ শতাংশ হলে বছরে বড় জোর ৫০-৬০ লাখ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে চললেও অদূর ভবিষ্যতে জমে থাকা বেকারত্বের খুব অল্পই ঘুচবে। উপরন্তু হাজার হাজার নতুন বেকার তৈরি হবে। এই নতুন শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা কোথায় যাবে, এর উত্তর ভারতের শিল্পায়নের কারিগররা দিতে পারছেন না। এটা হচ্ছে কেন? এক কথায় বললে, বিশেষ ধরনের পুঁজি নিবিড় শিল্পায়ন যেখানে কর্মসংস্থান তৈরি হয় খুব সামান্যই। আর সেই পথেই হাঁটছে বামফ্রন্ট অথচ কর্মসংস্থানের একটা হাস্যকর গল্প শোনানো হচ্ছে।

এ তো গেল নতুন কর্মসংস্থানের বহর। কিন্তু কেমন সেই কর্মসংস্থানের প্রকৃতি? এক কথায় নিয়মিত চাকরি, স্বনিযুক্তর সুযোগ শতাংশের বিচারে কমছে, বরং অনিয়মিত চাকরির অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে। নীচের সারণি সে-চিত্রটাই তুলে ধরছে।

আয়ের উৎস (জনসংখ্যার শতাংশ)

	স্বনিযুক্তি	নিয়মিত বেতন	অনিয়মিত বেতন
১৯৮৭-৮৮	৫৬·০	১৪·৪	২৯·৬
১৯৯৩-৯৪	৫৪·৮	১৩·২	৩২·০
৯৯-২০০০	৫২·৯	১৩·৯	৩৩·২

এই হিসেবের একটাই অর্থ, এ জাতীয় পুঁজি-নিবিড় **'উন্নয়ন'** প্রক্রিয়ায় চাকরি বা বেতনের অস্থিরতা বাড়ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ কমছে। বড় পুঁজি ছোট ছোট উদ্যোগকে গ্রাস করছে। বড় কারখানার সঙ্গে নতুন অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রসার লাভ করলেও তা স্বনিযুক্তির ধ্বংসকে ঠেকাতে পারছে না। অন্যদিকে, চাকরির নিশ্চয়তা কেড়ে নিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রমিককে বাধ্য করা হচ্ছে খুব অল্প বেতনে শ্রম বিক্রি করতে। আর এটা ঘটছে সারা পৃথিবী জুড়ে। মানুষকে প্রতিদিন আরও বেশি বেশি লড়তে হচ্ছে টিকে থাকার জন্য।

দেশ জুড়ে অবিশ্রাম ঢাক্‌ঢোল পিটিয়ে চলছে আর্থিক সংস্কারের রথ। প্রথমে ১৯৮৪-৮৫ সালে এবং তারপর ১৯৯১-তে ভারতের অনেকটাই নতুন পথে চলা শুরু। সে সময় সর্ব-রোগ-হরা হিসেবে হাজির করা হয়েছিল উদারনীতির পথকে। বিশেষ করে যুক্তিটা ছিল এমনই যে ভারতে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রমিক রয়েছে। তাকে কাজে লাগাতে গেলে দরকার পুঁজি। পুঁজি কেন্দ্রিক শিল্পায়ন হলে শুধু শহরেই নয় গ্রামেও কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে। আর শুধু অত্যাধুনিক শিল্প বা পরিষেবাই নয় কৃষিকে সরকারি ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করলে সেখানেও ব্যাপক বিনিয়োগ হবে, হবে প্রচুর কর্মসংস্থান তার সঙ্গে দারিদ্র্য, অসাম্যও মিটবে। দেখা যাক অন্তত কর্মসংস্থানের নিরিখে গত ১৫ বছরের বিনিয়োগে ভেসে আমরা কী পেলাম।

প্রতি ১০০০ জনে কর্মরতর সংখ্যা (সাধারণ নিয়োগ অনুসারে)

॥ সূত্র: এন.এস.এস.ও. ৬১ তম সার্ভে রাউন্ড রিপোর্ট নং: ৫১৫; পৃষ্ঠা: ৭৬॥

বছর	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল			গোটা ভারত		
	পুরুষ	নারী	সব মিলিয়ে	পুরুষ	নারী	সব মিলিয়ে	পুরুষ	নারী	সব মিলিয়ে
২০০৪-০৫	৫৪৬	৩২৭	৪৩৯	৫৪৯	১৬৬	৩৬৫	৫৪৭	২৮৭	৪২০
৯৯-২০০০	৫৩১	২৯৯	৪১৭	৫১৮	১৩৯	৩৩৭	৫২৭	২৫৯	৩৯৭
১৯৯৩-৯৪	৫৫৩	৩২৮	৪৪৪	৫২১	১৫৫	৩৪৭	৫৪৫	২৮৬	৪২০
১৯৮৭-৮৮	৫৩৯	৩২৩	৪৩৪	৫০৬	১৫২	৩৩৭	৫৩১	২৮৫	৪১২
১৯৮৩	৫৪৭	৩৪০	৪৪৫	৫১২	১৫১	৩৪০	৫৩৮	২১৬	৪২০
১৯৭৭-৭৮	৫৫২	৩৩১	৪৪৪	৫০৮	১৫৬	৩৪১	৫৪৩	২৯৭	৪২৩
১৯৭২-৭৩	৫৪৫	৩১৮	—	৫০১	১৩৪	—	—	—	—

এক এক করে দেখা যাক গ্রাম-শহর-পুরুষ-মহিলা এবং সবশেষে সবাই মিলে কে কী পেলেন। প্রথমেই যদি শহরের পুরুষদের কথা বলি তবে দেখব প্রতি ১,০০০ পুরুষের মধ্যে কর্মরতর সংখ্যাটা গত ৩২ বছরে (১৯৭৩-২০০৫) বেশ বেড়েছে (৫০১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৪৯)। এটা বেশ বড় একটা বৃদ্ধি। শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা অনেকটাই ভাল হয়েছে, যদিও ১৯৯৩-৯৪ (উদারনীতি গ্রহণের পর পর) সালকে ভিত্তি

ধরলে এই বাড়াটা তেমন কিছু নয় (১৫৫ থেকে ১৬৬), ১৯৭৭-৭৮-এর নিরিখে এই বৃদ্ধি আরও কম। এর মধ্যেও যেটা চোখে লাগে তা হল শহরে কর্মরত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যার (অনুপাত) মধ্যে কী কুৎসিৎ ফারাক। আর এই ফারাকটা কিন্তু উদারীকরণের পর থেকে বাড়ছে! সবশেষে যদি শহরের সর্বমোট কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি দেখি তবে সেটা মোটেই আহামরি কিছু নয়। এটা বিশেষ ভাবে ১৯৯৩-৯৪-এর সাপেক্ষে সত্যি। যেটা সত্যিই ভাবনায় তা হল শহরে সর্বশেষ কর্মসংস্থানের অবস্থা। এত ঢক্কানিনাদের পর প্রতি হাজারে মাত্র ৩৬৫ জন! তবু যদি ধরেও নিই যে ইন্ডিয়া শহরের পুরুষের হাত ধরে শাইনিং, গ্রামের দিকে চোখ ফেরালে উদারীকরণের প্রবক্তাদের পণ্ডশ্রমের অনুভূতিই হওয়া উচিত। গ্রামের পুরুষদের প্রতি হাজারে সব রকমের কাজে যুক্ত এমন লোকের সংখ্যা বাড়ে তো নিই, বরং ১৯৭৭-৭৮ কিংবা ১৯৯৩-৯৪-এর তুলনায় খানিকটা কমেইছে। অন্যদিকে গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থা ১৯৭২-৭৩-র তুলনায় ভাল হলেও ১৯৮৩-র তুলনায় ২০০৪-০৫-এ বেশ খারাপ হয়েছে। তবে একটা কথা বলা উচিত মহিলাদের মধ্যে গ্রামের মহিলাদের অবস্থা শহরের তুলনায় অনেকটা ভাল। এটা আধুনিক শিল্প-পরিষেবা ভিত্তিক শহরের তথাকথিত উন্নয়নের সম্ভবত সবচেয়ে বড় বিফলতা। এই 'উন্নয়ন' কিছু অংশের মানুষের জন্য স্বাচ্ছল্য আনলেও নারী-পুরুষের কাজের সমানাধিকারের প্রশ্নে চূড়ান্ত ব্যর্থ। গ্রামের সব মিলিয়ে মোট কর্মসংস্থানের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৯৮৩ কিংবা ১৯৯৩-এর তুলনায় এখন অবস্থা খারাপই হয়েছে।

অন্যদিকে, গ্রাম-শহর মেলালে পুরুষের কর্মসংস্থানের হার প্রায় একই থেকে গেছে। আর মহিলাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। তাই সব মিলিয়ে নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের অসাম্য বেড়েছে। শেষে যদি সার্বিক ছবিটা দেখি, প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় কর্মরত মানুষের অনুপাত এ মুহূর্তে ১৯৮৩ ও ১৯৯৩ সাথে একেবারেই একই জায়গায় আছে। তাহলে কীসের উন্নয়ন হল এতদিন; দীর্ঘ দু'দশক? কোথায় পৌঁছলাম আমরা? হ্যাঁ, সরকারি মাপকাঠিতে দারিদ্র্য হয়ত কিছুটা কমেছে। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তর আয় বেড়েছে বহুগুণ কিন্তু অসাম্য বেড়েছে সর্বত্র, সব ধরনের অসাম্য।

পাল্টা যুক্তি হিসেবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অনেক সময়েই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিংবা এটাও বলা যেতে পারে যে, দেশ জুড়ে নগরায়ণ হচ্ছে, তাই শহরে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। এ-সব মিলিয়ে শহরের শিল্পপরিষেবা ক্ষেত্রের উপর নতুন কর্মসংস্থান তৈরির চাপ ঊর্ধ্বমুখী। এর মধ্যেও যে শহরের অবস্থা কর্মসংস্থানের মাপকাঠিতে কিছুটা ভাল হয়েছে, এটাই অনেক। এগুলো আসলে অক্ষমের যুক্তি। এই সব সমস্যা মেটানো যাবে বলেই তো দু'দশক ধরে উদারনীতির অন্ধ ভক্তরা বলে এলেন। শহর নিয়ে বেশি মাতামাতি চলছে ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে এখনও ভারতে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামেই বাস করে। সংখ্যার বিচারে, ২০০১ সেনসাস অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার (১০২,৭০ লাখ) মধ্যে ৭৪ কোটি ১৬ লাখ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। আর শহর নিয়েও বড়াই করার মতো কিছুই অর্জন করা যায়নি। আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্যই উদারীকরণের নামে এত উচ্ছেদ, এত অসাম্য, এত ক্ষতি স্বীকার! এই সব হিসেব কিন্তু

মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যার খতিয়ান। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে স্থায়ী চাকরির কিংবা স্বনিযুক্তির সুযোগের অনুপাত ক্রমশ কমছে আর বাড়ছে অনিয়মিত কাজের শতাংশ— অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহর। অথচ সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য কিছু ইনুস্যুরেন্স কিংবা নামমাত্র পেনসন প্রকল্প দিয়েই সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।

আমাদের রাজ্যে বুদ্ধবাবু নরেন্দ্র মোদি কিংবা চন্দ্র বাবু নাইডুর পথে হাঁটতে চাইছেন। তাঁর বড়ো স্লোগান কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। আর এই গল্পে বারে বারেই চলে আসছে দেশের আর সব রাজ্যের এগিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেশের এগিয়ে যাওয়ার গল্পটা অন্তত কর্মসংস্থানের হিসেবে যে একটা বড় ধাক্কা সেটা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিছু তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যায়। আমাদের রাজ্যও যদি ওই মিথ্যে গল্পের পেছনে দৌড়য় তার ফল ভাল তো হবেই না, উপরন্তু ছোটজোত নির্ভর কৃষি আর গ্রাম-শহরের শ্রম-নিবিড় ক্ষুদ্র শিল্প-পরিষেবা ভিত্তিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে চিরতরে বিসর্জন দেবে। আর যাই হোক, ধার করা পুঁজি দিয়ে উন্নয়ন হয় না। তা শুধু সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই বিরোধী নয় প্রকৃতি/পরিবেশের ভারসাম্যেরও পরিপন্থী।

দুটো ছোট তথ্য দিয়ে শেষ করি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এন.এস.এস.) ২০০৪-০৫ বলছে গ্রামীণ পুরুষ গ্র্যাজুয়েট ও তার থেকেও বেশি শিক্ষিতদের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার ৯৩-৯৪-র তুলনায় সামান্যই বেড়েছে (১ শতাংশ)। গ্রামের মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার কমেছে ২ শতাংশ। অন্যদিকে শহরের উচ্চশিক্ষিত (গ্র্যাজুয়েট ও তার বেশি) পুরুষের কর্মসংস্থানের হার ১৯৯৩-৯৪-র তুলনায় ২০০৪-০৫-এ ২ শতাংশ কমেছে। আবার শহরের মহিলাদের ক্ষেত্রে তা কমেছে ১ শতাংশ। সব মিলিয়ে এটা বলাই যায় উচ্চশিক্ষিতদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা (Probability) কমেছে! হায় উদারনীতি! আধুনিক শিল্প-পরিষেবায় এমনকী উচ্চশিক্ষিতদেরও সুযোগ কমেছে গত দশ বছরে।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা হায় হায় করছি আমাদের উচ্চশিক্ষিতদের দুরবস্থার কথা ভেবে। কিন্তু তথ্য একটা অদ্ভুত কথা বলছে। প্রতি হাজার গ্রামীণ পুরুষের মধ্যে ৫৭৪ জন ২০০৪-০৫ সালে কর্মরত। এই সংখ্যাটা কিন্তু ভারতের গড়ের (৫৪৬) থেকে অনেক উপরে। আবার শহরের পুরুষদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা হাজারে ৫৯৫, অথচ ২০০৪-০৫-এ ভারতের গড় মাত্র ৫৪৯! আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল, যে-সব রাজ্যের কথা শুনে আমরা ঈর্ষা বোধ করি তাদের সবারই উপরে এই প্রতি হাজার শহরের পুরুষের মধ্যে কর্মরতর সংখ্যায় (৫৯৫) পশ্চিমবঙ্গের স্থান!! ১৯৯৯-২০০০-এও এই প্রথম স্থানটা রাজ্যের দখলেই ছিল। অথচ উল্টোদিকে কর্মসংস্থানের মাপকাঠিতে গ্রাম শহরের মেয়েদের অবস্থাটা খুবই খারাপ। সেটা এতটাই কুৎসিৎ যে ছাপার অযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গবাসীর লজ্জা হবে। পাঠক দয়া করে সরকারি রিপোর্ট দেখে নেবেন। আর যাই হোক বুদ্ধবাবুর মরা কান্নায় মেয়েদের নিয়ে চিন্তাভাবনা বলতে দায়সারা মুরগি পালন কিংবা 'ঝি-গিরি' নিয়ে উপদেশ দেওয়ার বাইরে কিছু দেখিনি।

তাহলে এই গেল গেল রব আর টাটা, সালিম, রিলায়েন্স কিংবা ওয়ালমার্ট প্রীতির কি অন্য কোনও তাৎপর্য আছে? দুঃখিত, 'নিন্দুক'রা কিন্তু তাই মনে করছে!